নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত
জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক
জুন, ২০১৮

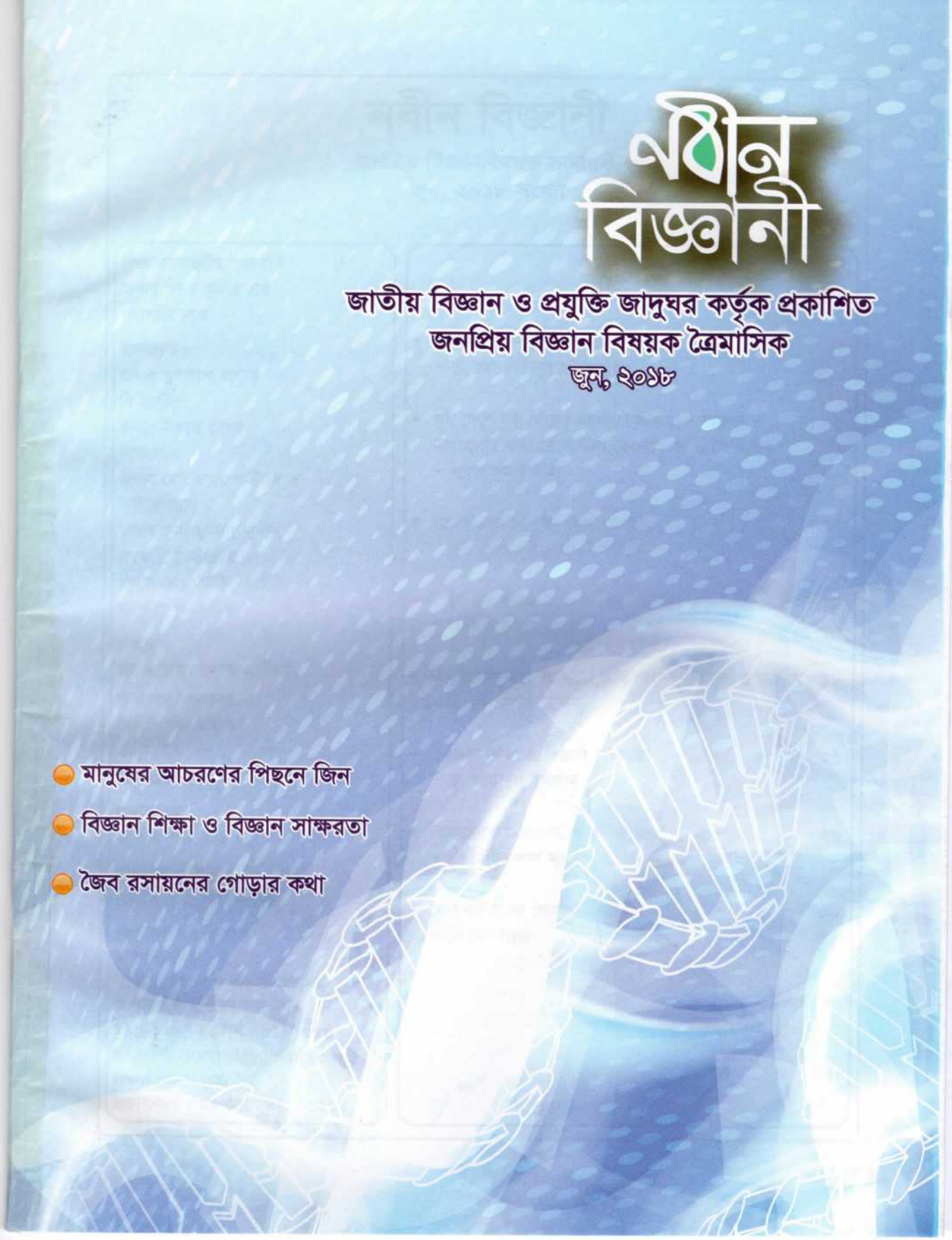

- মানুষের আচরণের পিছনে জিন
- বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান সাক্ষরতা
- জৈব রসায়নের গোড়ার কথা

নবীন বিজ্ঞানী

জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী

জুন, ২০১৮ সংখ্যা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদক :
জনাব সুকল্যাণ বাছাড়
কিউরেটর
জনাব নিশাত বেগম
কিউরেটর
জনাব মো: কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান
জনাব মো: মুমিনুর রশীদ
সহকারী কিউরেটর
জনাব মো: মোমিত হাসান
সহকারী কিউরেটর

প্রচ্ছদ :
জনাব রবিন বসাক আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা/মুদ্রণালয় :
তিশা এন্টারপ্রাইজ
৩২ নারিন্দা রোড, নারিন্দা
ঢাকা-১১০০।

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১১২০৮৪
ই-মেইল: dgnmst@gmail.com
www.nmst.gov.bd
প্রকাশকাল : ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

সূচিপত্র

- মানুষের আচরণের পেছেনেও জিন — ১
  – ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
- দুই দেশে দুই মেয়ের মহাকাশ অভিযান: সাফল্য ও অবহেলার কথা ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা ও জেরি কব্ — ৫
  – সুব্রত কুমার সাহা
- ঘুমের ঔষধঃ শেফা বনাম নেশা — ১২
  – ডাঃ মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী
- বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী ও তাদের সংরক্ষণ — ১৫
  – আমিনা বেগম
- ক্যামিকেল দিয়ে পাকানো আম ধ্বংস, বাস্তবতা ও করণীয় — ১৮
  – ড. মো. শরফ উদ্দিন
- বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান সাক্ষরতা — ২১
  – ড. আমানুল ইসলাম
- অজানাকে জানাঃ অ্যারারুটের গল্প — ২৬
  – ডঃ মিহির লাল সাহা
- জৈব রসায়নের গোড়ার কথা — ৩০
  – সৌমেন সাহা

"নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সেসব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।

প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক
"নবীন বিজ্ঞানী"
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২০৮৪
E-mail : infonmst@gmail.com, dg@nmst.gov.bd
facebook : www.facebook.com/nmstbdpg/

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় সম্পাদক-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

টায়ার)। বিজ্ঞানের ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকস্মিক ঘটনার মধ্যে পড়ে এই আবিষ্কার। কিন্তু রাবারকে এই অবস্থায় পৌছতে হলে সঠিকভাবে কতক্ষণ কতটা তাপ দিতে হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে অনেক মেহনতের মূল্য দিয়ে তিনি শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, উচ্চচাপে স্টিমের সাহায্যে চার থেকে ছয় ঘন্টা 270 ফারেনহাইট উষ্ণতায় উত্তাপ উৎকৃষ্টমানের রাবার পাওয়ার এটাই সঠিক শর্ত।

চালর্স গুডইয়ার

টমাস হ্যানকক

কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যতটা ছিল, ততটা ছিল না তাঁর বিষয়বুদ্ধি। আবিষ্কারের পর তাঁর কর্মকান্ড সেই কথাই বলে। তিনি এমন এমন জিনিস গড়ে তুলতে রাবার ব্যবহার করলেন যে তখনকার দুনিয়া তা ভাবতেও পারেনি। যেমন খাদ্যবস্তুর মোড়ক হিসাবে রাবারকে ভাবলেন 1850 সালেই- যা সম্প্রতি রাবার থেকে বানানো এক ধরনের প্লাস্টিক সামগ্রীর সাহায্যে সৃষ্টি করা গেছে। কিন্তু এইসব নানাধরনের কাজে মত্ত থেকে তিনি এতই আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন যে পেটেন্টের দরখাস্ত করতে যথেষ্ট দেরী হয়ে গেল। পেটেন্টের প্রয়োজনে পাঠানো তাঁর সালফার দিয়ে তাপ দেওয়া সামগ্রীটির (নমুনা) স্বরূপ উদঘাটন হওয়ার আগেই পদার্থটি টমাস হ্যানককের হাতে পড়ে, যিনি নিজেও এই একই কাজে বিশ বছর ধরে করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। হ্যানকক ঐ পরিবর্তিত রাবারের মধ্যে হলুদ সালফারকে চিনে ফেলেন ও এই সূত্র ধরে প্রক্রিয়াটির আঁচ পেয়ে যান। এর ফলে গুডইয়ারের আবিষ্কারের চার বছর পর 1843 সালে ঐ প্রক্রিয়ার পেটেন্ট নিয়ে গেলেন। শোনা গেল, গুডইয়ারের দরখাস্তের কয়েক সপ্তাহ আগেই হ্যানককের পেটেন্টের দরখাস্ত জমা পড়ে আছে। গুডইয়ারকে পেটেন্টের অর্ধেক শেয়ার দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। নিশ্চিত অর্থসম্পদ ত্যাগ করে জীবনসায়াহ্নে তিনি নিঃস্ব হয়েছিলেন- সুযোগ সন্ধানীর চক্রান্তের শিকার হলেন তিনি। যে গুডইয়ার কোম্পানির নাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছিল এবং কোটি কোটি ডলার মুনাফা লুটেছিল তার আদি প্রাণপুরুষ চার্লস গুডইয়ার 200000 ডলার ঋণ রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন 1860 সালে। শুধু তাই

মুখবন্ধ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়সমূহ সহজবোধ্যভাবে শিক্ষার্থী ও পাঠকদের মাঝে উপস্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি নিয়মতি ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী "নবীন বিজ্ঞানী" প্রকাশ করছে। নবীন বিজ্ঞানী প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজকে অন্ধবিশ্বাস, বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার মুক্ত করে গড়ে তোলা। এ প্রকাশনায় ৮ টি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশানার প্রবন্ধগুলো বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার খোড়াক কিছুটা মিটালে আমাদের প্রচেষ্ট্রা সার্থক হয়েছে বলে অনুধাবন করব। বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনসাধারণকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের একটি হাতিয়ার হলো আলোচ্য প্রকাশনা। যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমাদের প্রকাশনা একটু দেরিতে হলেও আলোর মুখ দেখেছে তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রকাশনাটি একটি মানসম্মত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এ প্রত্যাশা করি। লেখকদের নিকট থেকে আরো বেশি সহজবোধ্য ও মানসম্মত প্রবন্ধ/নিবন্ধ পাওয়ার আশা করি।

স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

মানুষের আচরণের পেছেনেও জিন

ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

মানুষের আচার আচরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানসিক বৈশিষ্ট্য। এটি মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে। এর মধ্য দিয়ে একজন মানুষের মন ও মননশীলতার খরব বেশ খানিকটা আচ করা সম্ভব হয়। পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে একজন মানুষের গ্রহণযোগ্যতাও বহুলাংশে মানুষের আচার আচরণের উপরই নির্ভরশীল। একজন মানুষকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করতে গেলে আবশ্যিকভাবে যেসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা যায় তার অন্যতম একটি হলো আচার আচরণ। মানুষে মানুষে আচরণগত পার্থক্য যেমন রয়েছে আবার এটিও ঠিক যে আচরণগত দিক থেকে মানুষে মানুষে মিলও রয়েছে। চাইলে মানুষের আচরণের ধরনকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় বটে। সেটি মনোরোগবিদগণ কিংবা দর্শনতত্ত্বে মশগুল পন্ডিতগণের কাজ। আচরণগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে মানুষকে নানা কারণেই মূল্যায়ন করা হয়। মানুষ যে অন্য মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করে সেটি নির্ভর করে তাঁর আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর। অনেকের আচরণে মানুষ ভয় পায় বটে তবে মন থেকে শ্রদ্ধা পেতে হলে আচরণ মার্জিত হতে হয়, আচরণের মধ্য দিয়ে তাঁর উত্তম ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটতে হয়।

আচরণ জিন নিয়ন্ত্রিত কিনা এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা নানা রকম জীবে পরিচালনা করা বেশ সহজ। কিন্তু এই ধরনের মানুষে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। ফলে সরাসরি মানুষের আচরণের জন্য জিন দায়ী কি না বা কোন কোন জিন দায়ী তা যথেষ্ট জোর দিয়ে বলা খুব সহজ কাজ নয়। বংশগত পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য কোন মানুষই রাজী হবার কথা নয়, সেটি সংগতও নয়। সে কারণেই মানুষ এসব পরীক্ষার জন্য আদর্শ জীব নয়। অন্যদিকে মানুষের আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কোন বিষয় সম্পর্কে মানুষের অনুভূতিজাত সাড়া যা নিয়ে গবেষণা করা খুব সহজ কাজ নয়। তাছাড়া মানুষের বুদ্ধিমত্তা, ভাষা, ব্যক্তিত্ব এবং অনুভূতি এসবও পরিমাপ করা বেশ কঠিন। তবু মানুষের আচার আচরণ নিয়ে গবেষকদের নানা রকম পর্যবেক্ষণ রয়েছে। যদিও মানুষের এসব আচরণ নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণের দু'টি সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, সকল আচরণকে বস্তুনিষ্ঠভাবে সংজ্ঞায়িত করা এবং এদের পরিমাণাত্মক দিকে থেকে পরিমাপ করাও কঠিন। দ্বিতীয়ত, সকল আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিবেশগত বিভিন্ন ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের চূড়ান্ত বাহ্যরুপ প্রকাশের উপর পরিবেশের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আচরণের উপরতো বটেই।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষের আচরণের বংশাগতিক চর্চাটি অন্যান্য আরো ফ্যাক্টর দ্বারা ব্যহত হয়েছে। আগে এ বিষয়ক বহু পর্যবেক্ষণ আর চর্চা সাধিত হয়েছে কেবল মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা। এক্ষেত্রে বংশগতিবিদগণের নিকট থেকে কোন পরামর্শ বা তাদের সাথে এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। অধিকন্তু, যেসব বৈশিষ্ট্যের সাথে বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব এবং অনুভূতির সম্পর্ক রয়েছে এদের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। তাসত্বেও আচরণ নিয়ে বেশ খানিক গবেষণা ও অধ্যয়ন যে করা হয়নি তা কিন্তু নয়। একদিকে, এসব অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মানুষের নিরুপদ্রবে থাকার অধিকার লাঞ্ছিত

হয়, অন্যদিকে কোন কোন ব্যক্তির আচরণে অন্য কোন কোন মানুষের আচরণের থেকে যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায় তা থেকে কোন উপসংহারে পৌঁছা সত্যিই ভারী কঠিন। কখনো কখনো এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা নানা রকম মতানৈক্যেরও সৃষ্টি করে।

তো বোঝাই যাচ্ছে অনেক দিন মনোবিজ্ঞানী আর বংশগতিবিদদের মধ্যে আচরণগত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে একলা চলা নীতির কারণে এ বিষয়ে খুব একটা অগ্রগতি ঘটেনি। বিজ্ঞানী সি.সি. ডার্লিংটন এসব দেখে বলেছিলেন যে, মানুষের আচরণ নিয়ে কথা বার্তা বলা যেন সৌখিন সাহিত্যের এক মধুর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর মতে এর কারণ এই যে, মনোবিজ্ঞানী এবং বংশগতিক যাদের কাজ হলো আচরণের বিষয় বর্ণনা করা তারা একত্রে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৬৩ সালের পর থেকে এই দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তবু মানুষের আচরণের বংশগাত্যিক ব্যাখ্যা বিতর্কিতই থেকে যায়। গত দুই দশকের গবেষণা থেকে এখন এটা স্পষ্ট যে, মানুষের আচার আচরণ মানুষের দৃশ্যমান নানা বৈশিষ্ট্যের মতোই মূলত জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে জিনের নানা ক্রিয়া আন্তক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের আচার আচরণ একটি রূপ লাভ করে।

সাধারণভাবে কোন বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিতে গিয়ে মানুষ যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন বা প্রকাশ করে তাই হলো তাঁর আচরণ। যদিও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের আচার আচারণগত পার্থক্য দেখা যায়। তবুও সুক্ষ্মভাবে মানুষের আচরণের মূল ধারাটি খেয়াল করলে মোটাদাগে এ বিষয়ে একটি মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য আঁচ করা যায়। মানুষের আবেগ অনুভূতি, তাঁর মেধা ও মনন, তাঁর রুটি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আচরণের উপর অবশ্যই প্রভাব ফেলে। মানুষ যখন কোন কারণে আনন্দিত বা ব্যথিত হয় তখন মানুষ যে আচরণগত সাড়া দেয় প্রায় সকল মানুষের এর একটি সাধারণ পতিক্রিয়াজনিত রূপ প্রকাশ পায়। তা সত্বেও মানুষে মানুষেও প্রতিক্রিয়ার মাত্রা ও এর বহি:প্রকাশে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

মানুষ ছাড়া অন্য জীবে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আচরণের বংশগত তথা জিনগত ভিত্তি নির্ধারণ করা তুলনা মূলকভাবে সহজ। বংশগত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কোন মানুষকে যেমন রাজি করানো সম্ভব নয় তেমনি মানুষের আচরণের বিষয়ে আকর্ষণীয় সাড়া বিশেষ করে মানুষের মেধা, ভাষা, ব্যক্তিত্ব এবং আবেগ নিয়ে গবেষণা করা বেশ কঠিন। এ ধরনের চর্চার দু'টি মূল সমস্যা রয়েছে। এক, আচরণের এসব বিষয় সংজ্ঞায়িত করা এবং এদের পরিমাপ করা কঠিন। দ্বিতীয়ত, এরা পরিবেশিক নানা ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশের জন্য পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূণ। মানুষের আচরণের বিষয় জানতে হলে প্রয়োজন যেমন একক জিন বিশ্লেষণ, তেমনি জটিল বহু জিনগত বৈশিষ্ট্যের সাথে পারিপার্শিক উপাদানকেও একত্রে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন যা প্রায়শই বেশ কঠিন।

একটি জিনের কারণে মানুষের আচরণগত কি পরিবর্তন ঘটে তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা খুব সহজ কাজ নয়। তবে মানুষের কিছু একক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বংশগত অস্বাভাবিকতা কিভাবে মানুষের মগজ এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ, গঠন বা কার্যাবলীতে প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করলে এ বিষয়ে কিছুটা আভাস মিলতে পারে। মানুষের হান্টিংটন রোগ নিয়ে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়। এই রোগের মূল প্রভাবটি পড়ে মানুষের মগজের উপর। সাধারণত জীবনের পঞ্চম

দশকে এসে ধীরে ধীরে স্নায়ুর কার্যাবলী এবং এদের সমন্বয় ক্ষমতা লুপ্ত হতে থাকে। মগজের গঠণগত ক্ষয় যত ত্বরান্বিত হয় মানুষের ব্যক্তিত্বের তত পরিবর্তন ঘটে। মগজের কিছু নির্দিষ্ট স্থানের কোষের মৃত্যু ঘটে বলে এরকম লক্ষণ দেখা দেয়। অধিকাংশ রোগীই রোগটি শুরু হওয়ার ১০-১৫ বছরের মধ্যে মারা যায়।

বলাবাহুল্য হান্টিংটন রোগ একটি জিন নিয়ন্ত্রিত সমস্যা। এই রোগে আক্রান্ত মানুষ বিয়ে করে সংসারী জীবন যাপন করতে পারে। তবে উন্নত দেশের সচেতন পরিবারে সন্তানেরা একথা জানে যে, এরকম অস্বাভাবিকতা তাদের মধ্যে দেখা দেওয়ার শতকরা ৫০ ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই রোগের জিনটির অবস্থানও শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের ৪ নম্বর ক্রোমোজোমের খর্বাকৃতির বাহুতে এর অবস্থান। এই জিন তৈরি করে একটি বৃহদাকৃতির (৩৫০ কিলোডাল্টন) প্রোটিন। একে হান্টিংটিন বলা হয় যা পরিণত মানুষের মগজের কিছু কিছু নিউরনের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ একটি জিনের কারণেই মানুষের এই আচরণগত অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আনবিক মার্কার দিয়ে পরবর্তীতে এই জিনটির পূর্ণাঙ্গ গঠণসহ নানা রকম তথ্যই জানা সম্ভব হয়েছে। একটি জিনের ক্রিয়ার পরিবর্তন এই রোগটি ঘটায় এবং আচরণের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। এটি মানুষের আচরণের জিনগত ভিত্তিরও একটি প্রমাণ বটে।

মানুষের আচার আচরণের জন্য পরিবেশ কতটা দায়ী সেটিও বিবেচনায় নিতে হবে। মানুষের সকল আচার আচরণগত বৈশিষ্ট্য যে একটি জিন নিয়ন্ত্রিত কোন বৈশিষ্ট্য নয় তা বলাই বাহুল্য। আর একাধিক জিন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য কখনো পরিবেশের প্রভাবমুক্ত থাকে না। বরং জিন এবং পরিবেশের আন্তঃক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আচার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। এমন দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই যে, বহু অশিক্ষিত ব্যক্তির আচার আচারণ আশ্চর্যরকম মার্জিত, আবার অনেক শিক্ষিত মানুষের আচার আচারণ বেশ অগ্রহণযোগ্য। এর উল্টোটাও যে নেই তাও কিন্তু নয়। বহু অশিক্ষিত ব্যক্তির আচরণ অমার্জিত আর শিক্ষিত লোকের আচার আচরণ বেশ মার্জিত। ফলে শিক্ষাটাই আচার আচারণের একমাত্র নিয়ামক পরিবেশ নয়। আবার উন্নত পরিবেশে শিক্ষা লাভ করা মানুষের আচারণ অমার্জিত যেমন হতে পারে তেমনি সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় বেড়ে ওঠা মানুষের আচার আচরণও মার্জিত হতে পারে। এর উল্টোটাও সত্যি বলে প্রমাণিত বহু ক্ষেত্রেই। ফলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উন্নত পরিবেশই মার্জিত আচারণের একমাত্র নিয়ামক নয়। তাহলে পরিবেশের প্রভাবটা আসে কোথা থেকে সেটিও ভাবতে হবে যুক্তির নিরিখে অবশ্যই।

সকল আচরণগত বৈশিষ্ট্য আসলে একটি করে জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বেশ কিছু আচরণগত বৈশিষ্ট্য বহু জিন নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবেশের সাথে এদের আন্তঃক্রিয়ার ফসল। সিজোফ্রেনিয়া একটি মগজের জটিল অস্বাভাবিকতা। এটি এক ধরনের মানসিক সমস্যা যা সামাজিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, অদ্ভুত এবং মতিবিভ্রম বা বঞ্চনাজনিত আচরণ প্রদর্শন করে। এ রোগে আক্রান্ত মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয় এবং নির্দিষ্ট সময় বিরতিতে এ রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এটি বেশ জানাশুনা একটি অস্বাভাবিকতা যা সাধারণ জনসমষ্টির তুলনায় সিজোফ্রিনিয়া আক্রান্ত পরিবারে অনেক অধিক হারে দেখা দেয়। একজন আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ঘনিষ্টতা যত বেশি হয় এই অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা হত বৃদ্ধি পায়। এবাজাইগোটীয় অর্থাৎ সমরূপ যমজ এবং দ্বিজাইগোটীয় অথ্যাৎ ভিন্ন রূপ যমজের ক্ষেত্রে শতকরা ১৭ ভাগের মত পাওয়া গেছে। এসব গবেষণা থেকে সিজোফ্রিনিয়ার জিনগত ভিত্তি সম্পর্কে খানিকটা জানা সম্ভব

হয়েছে। অন্যান্য গবেষণা থেকে পরিবেশগত ঝুঁকি এ রোগের জন্য দায়ী বলে জানা গেছে। ফলে ইদানিংকালে সিজোফ্রিনিয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, রোগটি বংশগতভাবে ঘটে থাকে কিন্তু বংশগতভাবে নির্ধারিত নয়। রোগটির জন্য জিনের অবদান সুনির্দিষ্ট করে জানা সম্ভব হয়নি। তবে বিভিন্ন সময়ে রোগটি এক জিনীয়, দ্বিজিনীয় বা বহু জিনীয় নিয়ন্ত্রিত হয় বলে প্রস্তাব করা হয়।

সিজোফ্রিনিয়া রোগটির সাথে কত জিন আসলে জড়িত সেটি জানার জন্য বিজ্ঞানীরা ডিএনএ মাইক্রোএরে ব্যবহার করে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ জেনোম জুড়ে স্ক্যানিং করা হয়েছে সংযুক্ত জিন শনাক্ত করার জন্য। এসব জিনের প্রকাশ পরিবর্তিত হয়েছে এ রোগটির কারণে। গবেষকগণ রোগাক্রান্ত ও স্বাভাবিক মানুষের মগজের যে অঞ্চলে এ রোগটি প্রভাব ফেলে সেখান থেকে আরএনএ আলাদা করে এদের মাত্রক্রোএরে সম্পন্ন করেন। এতে দেখা যায় যে, পরীক্ষিত জিনগুলো গুচ্ছাকারে সজ্জিত যাদের একইরকম জীবীয় কার্যাবলী রয়েছে। কিছু জিন গুচ্ছের সিজোফ্রিনিয়ার জন্য নিম্ন মাত্রার প্রকাশ ঘটেতো অন্যদের ঘটে উচ্চমাত্রার প্রকাশ। এই বিশ্লেষণ থেকে রোগটির জন্য ৮৯টি জিনের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়।

বিভিন্ন গবেষকদল সিজোফ্রিনিয়ার জিনের প্রকাশ সম্পর্কে জানার জন্য দুই ডজনের অধিক জেনোম জুড়ে মাইক্রোএরে স্ক্যান করেছেন। তাঁর এর মাধ্যমে কয়েক সেট দায়ী জিন শনাক্ত করেছেন যাদের প্রকাশ সিজোফ্রিনিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। এই রোগ নিয়ে পরিচালিত মাইক্রোএরে স্ক্যান থেকে সকল গবেষকদল একই ফলাফল পেয়েছেন তা কিন্তু নয়, তবে সিজোফ্রিনিয়া রোগীর মধ্যে ৬টি মাইয়েলিন সংশ্লিষ্ট জিনের প্রকাশ অনেক হ্রাস পেয়েছিল। মোট কথা এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা আর গবেষণা থেকে মানুষের আচরণের জিনগত ভিত্তির কথা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছে। তবে কেবল জিন একা নয় বরং জিন এবং পরিবেশের জটিল আন্তঃক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের এসব আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

প্রবন্ধকার : প্রফেসর, কৌলতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

দুই দেশে দুই মেয়ের মহাকাশ অভিযান : সাফল্য ও অবহেলার কথা
ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা ও জেরি কব্

(৬ই মার্চ ১৯৩৭ এবং ৫ই মার্চ ১৯৩১)

সুব্রত কুমার সাহা

একটা দেশ মেয়েদের কতটা অধিকার দেয় তা দেখে ওই দেশের সংস্কৃতির ঔদার্য অনুভব করা যায়। আমরা দুটি বড় দেশের মেয়ের কথা বলব। একজনকে দেখব, জীবনের সবসেরা উচ্চতায় উঠেছিলেন। অন্যজন স্বপ্ন দেখতেন, সেরা সার্থকতায় পৌছাবেনা। দেশের আবহ তাঁকে সেখানে যেতে দেয়নি।

প্রথম মেয়ের নাম ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা। সোভিয়েত দেশের মেয়ে। জন্ম ১৯৩৭ সালের ৬ই মার্চ একটা ছোট্ট গ্রামে। বাবা ছিলেন ট্রাক্টর চালক। মা কাপড়ের কারখানায় কাজ করতেন। ১৯৪৫ সালে আট বছর বয়সে তিনি স্কুলে ভর্তি হন। আট বছর পড়েছেন। তারপর স্কুলের পড়া ছেড়ে দেন। বাড়িতে বসে করসপন্ডেস কোর্স নিয়ে পড়েছেন। ছোটবেলা থেকেই ভেলেন্টিনা প্যারাসুট চড়তে খুব ভালোবাসতেন। বাড়ির কাছাকাছি একটা ক্লাবে প্যারাসুট অভিযান শেখানো হতো। সেখানে তিনি ভর্তি হয়ে যান। শুধু যে প্যারাসুট চড়ে আকাশে ভেসে বেড়াবেন তা নয়। ভাবতেন, কতটা উপর থেকে তিনি লাফাতে পারবেন। ছোটবেলা থেকেই এই মেয়ে সাহসিনী। ১৯৫৯ সালের ২১ শে মে দিনটি তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। ওই দিন তিনি প্রথম প্যারাসুট থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। যাঁরা প্রশিক্ষক ছিলেন, তাঁরা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছেন, সুযোগ দিলে সে বিনা আয়াসে দুঃসাধ্য কাজ বেছে নেবে।

সোভিয়েতের প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা

১৯৫৯ সালে তাঁর বয়স যখন ২২ বছর, তখন তিনি মায়ের মতোই একটি কাপড় কারখানায় চাকরি করেন। চাকরির সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময় প্যারাসুট আরোহনই তাঁর ধ্যান জ্ঞান। ভেলেন্টিনার এই দক্ষতা তাঁর সামনে সুযোগের দরজা খুলে দেয়। তিনি সোভিয়েত দেশের মহাকাশ অভিযানের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

চাকরি ও প্যারাসুটি অনুশীলনের বাইরে মানুষের কাজে সময় দিতেন ভেলেন্টিনা। যেখানে থাকতেন সেখানকার কমিউনিস্ট যুবলীগের তিনি সম্পাদিকা হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ২৪ বছর। পরে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৬১ সাল। সোভিয়েত দেশের মহাকাশে অভিযান পরিকল্পনার প্রধান কারিগর ছিলেন সের্গেই করোলিয়েভ। পৃথিবীর সেরা একজন রকেট ইঞ্জিনিয়ার তিনি। তাঁর ইচ্ছে, পরের মহাকাশ অভিযানে একজন মহিলা থাকুক। ভেলেন্টিনা তাঁর যোগ্যতা দেখিয়ে ওই দলে জায়গা করে নেন। এই দিনটিও তাঁর জীবনে ভোলার নয়। তারিখটা ছিল ১৯৬২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। ৪০০ দরখাস্ত জমা পড়েছিল। এমন স্বপ্ন অভিযানের অভিজ্ঞতা কে না অর্জন করতে চান! শেষ পর্যন্ত পাঁচজন মনোনীত হয়েছিলেন। সেই পঞ্চকণ্যার মধ্যে একজন হলেন ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা। যাঁরা দরখাস্ত করেছিলেন তাঁদের তিনটি আবশ্যিক যোগ্যতা চাই। বয়স তিরিশের বেশি হবে না। উচ্চতা এক মিটার ৭০ সেন্টিমিটারের বেশি নয়। ওজন সত্তর কেজির কম হতে হবে।

শুধু দেহের গড়ন মহাকাশ অভিযানের শেষ কথা নয়। মনের গড়নও তেমন হওয়া চাই। বিপদ এলে ঝুঁকি নিয়ে লড়তে হবে। তেরেস্কোভা তেমন বাড়ির মেয়ে। বাবা ছিলেন শ্রমিক দলের নেতা। বাবার নাম ভ্লাদিমির তেরেস্কোভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লড়তে গিয়ে তাঁর বাবা মারা যান। ১৯৩৯ সাল, ভেলেন্টিনার বয়স তখন মাত্র দুই বছর। বাবা কেমন দেখতে ছিলেন, তাঁর মনে পড়ত না। মন তাঁর কেমন ধাতুতে গড়া ছিল। একটি উত্তরেই পরিচয় পাওয়া যাবে। মহাকাশ বিজয়ের পর সোভিয়েত দেশের সরকার তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল, দেশের সম্মান বাড়িয়েছেন তিনি। দেশের কাছে তিনি কী চান। উত্তর দিয়েছিলেন তেরেস্কোভা, 'যুদ্ধে আমার বাবা ঠিক কোথায় মারা গিয়েছেন, খুঁজে বের করে সবাইকে জানালে খুশি হব।' সোভিয়েত দেশ সে কাজ করেছে। সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেছে। সোভিয়েত-ফিনল্যাণ্ড সীমানায় এর অবস্থান, ভেলেন্টিনা সে জায়গায় বহুবার গিয়েছেন।

সেনাদলের যেমন কঠোর অনুশীলন করতে হয়, মহাকাশ অভিযাত্রীদের অনুশীলন তাঁর চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। কত কী পড়তেও তো হয়। অভিযানে যাবার আগে তেরেস্কোভাদের প্যারাসুট থেকে ১২০ বার লাফাতে হয়েছিল। বেশ কয়েক মাসের অনুশীলন শেষে পরীক্ষা দিতে হয়েছে আবার। ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে জানা গেল, চারজনকে সোভিয়েত বায়ুসেনা দলে জুনিয়ার লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

ঠিক হলো, ১৯৬৩ সালের মার্চ অথবা এপ্রিলে পরপর দুদিন দুটো 'ভোস্তক' মহাকাশযান পাঠানো হবে। প্রতিটি অভিযানে একজন মহিলা অভিযাত্রী থাকবেন। মহাকাশযান দুটোর নাম 'ভোস্তক-পাঁচ' ও 'ভোস্তক-ছয়'। প্রথমটিতে থাকবেন ভেলেন্টিনা। পরেরটায় থাকবেন পনোমারেভা। একই পথে যাবে দুই মহাকাশযান। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসেই আবার পরিকল্পনা বদলে ফেলা হলো। সিদ্ধান্ত হলো, পুরুষ মহাকাশচারী ভ্যালেরি বাইকভস্কি 'ভোস্তক-পাঁচ' এ চড়বেন। 'ভোস্তক-ছয়' এ একজন মহিলা মহাকাশচারী থাকবেন। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে এই অভিযানের শুরু হবে। মহিলা মহাকাশচারী কে হবেন? এই নিয়ে আলোচনায় বসলেন সবাই। শুপারিশ গেল রাষ্ট্রপতি ক্রুশ্চেভের কাছে। ভেলেন্টিনা মনোনয়ন পেলেন। আমেরিকার 'মার্কারি-সাত' অভিযানে সবচেয়ে কমবয়সী মহাকাশচারিনী ছিলেন গর্ডন কুপার। ভেলেন্টিনার বয়স তাঁর চেয়েও দশ বছরের কম ছিল।

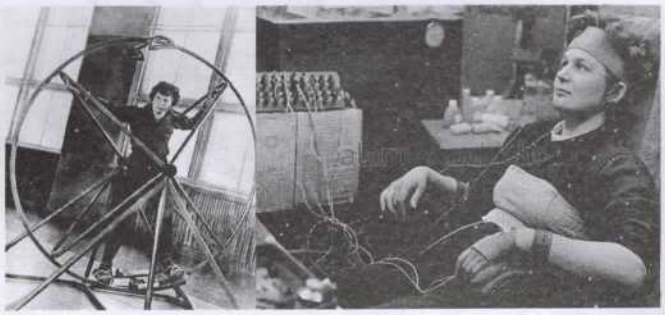

অভিযানে যাবার আগে তেরেস্কোভাকে বেশ কয়েক মাসের অনুশীলন শেষে পরীক্ষা দিতে হয়েছে

১৬ই জুন ১৯৬৩ 'ভোস্তক-ছয়' মহাকাশে উঠল। ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভ প্রথম মহিলা পৃথিবীর, যিনি মহাকাশে উড়লেন। পৃথিবকীর কক্ষপথে তিনি ৪৮ বার প্রদক্ষিণ করেছিলেন। প্রায় তিনদিন শূণ্যে কাটিয়েছেন। আমেরিকা তখন অতটাই পিছিয়ে, আমেরিকার সব ক'টি অভিযান মিলে সকলে যতক্ষণ মহাকাশে ছিলেন, একা ভেলেন্টিনা তার চেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন। দিগন্তরেখার আলোকচিত্র তুলেছেন তিনি। পৃথিবীতে অনেকেই রেকর্ড গড়েন। পরে কেউ এসে সেই রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। ভেলেন্টিনার আগে আর কারও তাঁর মতো রেকর্ড নেই। সকলেই তাঁর রেকর্ড ভাঙ্গতে চেয়েছেন। যত যাই রেকর্ড ভাঙ্গুন, প্রথমতো হতে পারবেন না।

পৃথিবীর বুকে ফিরে এসে বায়ুসেনা একাডেমিতে পড়তে ভর্তি হলেন ভেলেন্টিনা। মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ হিসাবে স্নাতক ডিগ্রী নিলেন। ১৯৭৭ সালে ভেলেন্টিনা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করলেন। পড়াশুনার নেশা তাঁর জীবনভর ছিল। রাজনীতিতেও প্রচুর সময় দিয়েছেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৯ সাল প্রর্যন্ত সুপ্রিম সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য ছিলেন তিনি। ১৯৬৯ থেকে ১৯৯১ দীর্ঘ ২২ বছর ভেলেন্টিনা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৭ সালে ৬০ বছর বয়সে তিনি সোভিয়েত দেশের বায়ুসেনা বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা এবং আন্দ্রিয়ান নকোলিয়েভ এবং তাঁদের এক মেয়ে

ঘর সংসারও করেছেন 'ভোস্তক-ছয়' এর মহাকাশচারী দলে অবিবাহিত ছিলেন দুই জন। ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা এবং আন্দ্রিয়ান নিকোলিয়েভ। বন্ধুরাও বায়না ধরেছিলেন তখন। দু'জনকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিলে কেমন হয়! ১৯৬৩ সালে বিয়ে হল দু'জনের। ওই বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সোভিয়েতের রাষ্ট্রপতি নিকিতা ক্রুশ্চেভ। কোটি কোটি টাকা খরচ হয়নি। তবু কি একে রাজকীয় বিয়ে বলা যায় না? আট বছরের বড় ছিলেন নিকোলিয়েভ। ২০০৪ সালে তিনি মারা যান। তাঁদের এক মেয়ে। চিকিৎসক, মেয়ে গর্ব করে বলেন, 'বাবা মা দু'জনেই মহাশূন্যযাত্রী, পৃথিবীতে আর কারো নেই।'

বিশ্ব শান্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা। ১৯৬৬ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সদস্য হয়েছেন। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো শহরে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে যে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ভেলেন্টিনা সোভিয়েত প্রতিনিধি ছিলেন। আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশনের সহ-সভানেত্রীর পদও তিনি অলঙ্কৃত করেছেন। সোভিয়েত-আলজিরিয়া মৈত্রী সমিতির সভানেত্রী ছিলেন।

ভেলেন্টিনা তাঁর জীবনে বহু পদক ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। সোভিয়েত দেশের সর্বোচ্চ পদকের নাম 'হিরো অফ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন'। ওই পদক তিনি লাভ করেছেন। 'অর্ডার অব লেলিন', 'অর্ডার অব অক্টোবর রিভুলিউশন' পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর অর্জিত পদকের সংখ্যা প্রচুর। সেই তালিকায় আমরা যাব না। পৃথিবীর নানা দেশ তাঁকে সম্মানিত করেছে। 'হিরো অফ সোস্যালিস্ট লেবার অফ চেকোশ্লোভাকিয়া', 'হিরো অফ লেবার অফ ভিয়েতনাম' ও 'হিরো অফ মঙ্গোলিয়া' শিরোপা পেয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘ তাঁকে 'কার্লমার্ক্স শান্তি স্বর্ণপদক' ও 'সিম্বা আন্তর্জাতিক মহিলা আন্দোলন পুষ্কার'-এ সম্মানিত করেছে। ১৯৯০ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ভেলেন্টিনাকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি দান করেন।

ভেলেন্টিনা তাঁর জীবনে বহু পদক ও স্বীশৃতি পেয়েছেন। পেয়েছেন সোভিয়েত দেশের সর্বোচ্চ পদক 'হিরো অফ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন', পেয়েছেন 'অর্ডার অব লেলিন' সহ অসংখ্য উপাধি ও পদক।

বেঁচে আছেন তিনি। চাঁদের একটি গর্ত তাঁর নামে ইতিমধ্যেই নামাঙ্কিত হয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র পতনের পর তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন। এই ভাঙ্গনে দেশের সম্মান বাড়েনি। কিন্তু তিনি তাঁর দেশে ও দেশের বাইরে আজও চিরবরেণ্যা। 'বীররমনী' বলতে কারো কুণ্ঠা নেই। কিছুদিন আগে তাঁর ৭০তম জন্ম দিবসে সাংবাদিকেরা জানতে চেয়েছিলেন, কী স্বপ্ন দেখেন এখন তিনি? উত্তরে তিনি বলেছেন, "মঙ্গলে যেতে ইচ্ছে করে।" মুচকি হেসে বলনে, 'যাওয়াটা যে ওয়ান ওয়ে হবে তা তিনি বুঝতে পারছেন'।

অলিম্পিকের মশাল হাতে ভেলেন্টিনা

একজন মানুষের জীবন যতটা কাজে লাগালে সার্থকতা অর্জিত হয় ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা তার সবটুকু কাজে লাগিয়েছেন। মহাকাশের এই প্রথম 'আকাশ-পরী'কে কেউ কখনো ভুলতে পারবে না।

সোভিয়েত দেশে 'ভোস্তক-ছয়' অভিযানের অভিযাত্রী ছিলেন ভেলেন্টিনা। আর আমেরিকায় 'মার্কারি-তেরো' অভিযানের অভিযাত্রী জেরি কব্। এই অভিযানের সুযোগ পেতে আমেরিকায় দরখাস্ত করেছিলেন ২৫ জন। ১৩ জনকে বাছা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কী হলো সে কথাই এখন বলব।

১৯৬০ সাল। ডাক্তার উইলিয়াম র‍্যানডল্ফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডোনাল্ড ফ্লিকিঞ্জার পুরস্কার জয়ী বিমান চালিকা জেরি কাব্-কে লাভলেইস মেডিক্যাল ফাউন্ডেশনে আমন্ত্রণ জানান। আরো কয়েকজনকেও তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা, এঁরা সকলে মহাকাশ অভিযানে যাবার উপযুক্ত কিনা পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি তাঁরা মহাকাশে যেতে চান ও যাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন, উইলিয়াম (যিনি 'নাসা'র জীববিদ্যা বিভাগের প্রধান উপদেষ্টা) 'মার্কারি-অভিযান'-এর সম্ভাব্য অভিযাত্রী হিসাবে তাঁদের নাম পাঠাবেন।

এগিয়ে এলেন জেরি কব্। উইলিয়াম দেখলেন, জেরি মহাকাশে যাবার শতভাগ যোগ্য। সুইডেনের স্টকহোম শহরের এক সম্মেলনে উইলিয়াম র‍্যানডল্ফ সে কথা ঘোষণা করলেন। বলা দরকার, 'নাসা' মহাকাশ অভিযানের কথা ভাবলেও মেয়েদের উপযুক্ততা বেছে নিয়ে নির্বাচনের পরিকল্পনা তখনও গ্রহণ করেনি। ব্যক্তিগত উদ্যোগ না থাকলে আমেরিকার মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে মেয়েদের নাম আরো পরে হয়তো যোগ হত।

আমেরিকার 'মার্কারি-অভিযান'-এর সম্ভাব্য অভিযাত্রী ছিলেন জেরি কব্।

১৯৬১ সালে ইউলিয়াম জানালেন, ওরা ১৯ জন মহিলাকে পেয়েছেন যাঁদের মহাকাশে পাড়ি দেবার পুরোপুরি সক্ষমতা রয়েছে। মনে রাখবেন পাঠক, উইলিয়াম যখন 'মহাকাশচারিণী'র কথা ভাবছেন তখন পর্যন্ত মহাকাশে কোন মানুষ পাড়ি দেয়নি। প্রাথমিক পরীক্ষার নির্মমতা (!) ও কম নয়। মহাশূণ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এক বড় রকমের কাজ। ১৯ জনের প্রাথমিক তালিকা থেকে ১৩ জনের নাম বাছা হলো, জেরি কব্, ওয়ালি ফাঙ্ক, আইরিন লেভারটন, মার্টল ক্যাগল, জেন হার্ট, নোরা স্টুমবাও জেরি স্লোন, রিয়াহুব্ল, সারা গর্লিক, বার্টিন স্টিডম্যান, জেন ডায়েত্রিচ, মারিয়ান ডায়েত্রিচ ও জন হিক্সন।

এরপর নৌসেনাদের বিদ্যালয় থেকে জানান হলো, লাইভেইস ক্লিনিকের পরীক্ষা যথেষ্ট নয়। আরো পরীক্ষা করতে হবে। নৌসেনাদের যেমন কিছু বাড়তি ক্ষমতা থাকে, এঁদেরও তেমন রয়েছে কিনা দেখা দরকার। তাই এমন বেসরকারী উদ্যোগে তারা সহযোগীতা করতে পারবেন না। 'নাসা' এলে ভেবে দেখা যেতো। সকল শিক্ষার্থীকে টেলিগ্রাম দিয়ে জানানো হলো, আর কোন নতুন কিছু হবে না। ১৩ জনের মধ্যে দু'জন নিজের পাকাপাকি চাকুরি ছেড়ে এমন অভিযানে যোগ দিতে এসেছিলেন। টেলিগ্রাম পেয়ে সকলেই মুষড়ে পড়েন। কিন্তু দু'জন হার মানতে নারাজ। একজন জেরি কব্ ও অন্যজন জেন হার্ট। তাঁরা রাজধানী ওয়াশিংটনে ছুটে গেলেন। রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডিকে চিঠি দিলেন। উপরাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসনের সঙ্গে দেখা করলেন। এ জিনিষ বহুদূর গড়াল।

১৯৬২ সালের ১৭ ও ১৮ই জুলাই দু'দিন ধরে গণশুনানী হল। প্রশ্ন তুললেন অনেকেই, আমেরিকার মহাকাশ অভিযান প্রকল্প তো পুরোপুরি বাতিল হচ্ছে না। ছেলেরা যদি যেতে পারেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেয়েরা যেতে পারবেন না কেন? মেয়েদের অধিকার কেড়ে নিতে চাইলেন কারা? দুই বছর ধরে বাকবিতণ্ডা চলল। সমানাধিকারের আইন আলোচনায় উঠে এলো। কব্ ও হার্ট ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী ছিলেন না। তাঁরা লড়াই চালিয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগে মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন করা হতো তাদের, যেন তাঁরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান লাভলেইস ফাউন্ডেশনের মুনাফার কথা ভেবে এগিয়ে এসেছেন। মহিলাদের মেধা বিচারের চেয়ে ভিন্নতর বিচার বড় হয়ে দেখা দিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, 'নাসা'-ও প্রতিনিধি জর্জ লো ও সুপরিচিত মহাকাশচারী জন গ্লেন ও স্কট কার্পেন্টার প্রকাশ্যে বললেন, মেয়েরা মহাকাশে যাওয়ার উপযুক্ত নন। স্নাতক না হলে বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি না থাকলে 'নাসা' কাউকে 'উপযুক্ত' বিবেচনা করে না। ১৩ জন মেয়ের একজনেরও সেই ডিগ্রি নেই। কাজেই নাসা কারো কথা ভাবতে পারছে না।

১৯৬৩ সালে ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা মহাকাশে পাড়ি দিলেন। আমেরিকার তখন লজ্জা হলো। 'লাইফ' ম্যাগাজিন 'নাসা' ও সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করতে থাকল। ওই ১৩জন মেয়ের ছবি ও যোগ্যতা ছাপিয়ে আমেরিকায় ছড়িয়ে দেওয়া হল। মেয়েদের অধিকারবোধে 'নির্বিকার' আমেরিকা শোরগোলের দেড় দশক পরে ১৯৭৮ সালে ঠিক করেছে, মেয়েরা মহাকাশ অভিযানে যেতে পারবেন। তখন মহাকাশ অভিযানের তালিকায় প্রথম মার্কিন মহিলার নাম স্যালি রাইড। ১৯৮৩ সালে, ভেলেন্টিনার দুই দশক পরে তিনি মহাকাশ অভিযাত্রীদের তালিকায় নিজের নাম যোগ করতে পেরেছেন।

সবশেষে আবার জেরি কব্-এর কথায়ই ফিরে যাই। ১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ আমেরিকার ওকলাহোমায় তাঁর জন্ম। বয়সে ভেলেন্টিনার চেয়ে ছয় বছরের বড়। বাবা ছিলেন লেফটেনেন্ট কর্ণেল ইউলিয়াম কব। মা হেলেনা বাটলার কব্। মাত্র ১২ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে ওপেন-ককপিট বিমানে চড়েছেন। ওকলাহোমা সিটি ক্লাসের হাইস্কুলে জেরির লেখাপড়া শুরু। ১৬ বছর বয়সে তিনি পাইলটের লাইসেন্স পেয়ে যান। আর ১৮

বছর বয়স হতেই পেয়ে যান পাইলটের কর্মাশিয়াল লাইসেন্স। যখন তিনি হাইস্কুলের ছাত্রী। সার্কাসের লিফলেট বিলি করতে ছোট্ট আকাশযানে চড়ে শহরময় ঘুরেছেন। এমন অনেকদিন হয়েছে। ওইযানের পাখার তলায় ঘুমিয়ে পড়েছেন জেরি।

স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে তিনি ওকালাহোমা কলেজে পড়েন। মেয়েদের কলেজ। শস্য গুড়ো করে ও আকাশযানের ট্রেনিংয়ে সহায়তা করে তিনি টাকা রোজগার করতেন। পাইলটের চাকরিও খুঁজেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুদ্ধ বিমানের চালকেরা সব কাজ হারিয়েছেন। তাঁরাই কাজ পাচ্ছেন না। তিনি কেমন করে পাবেন! যাই হোক, বেশ কিছুদিন পর মায়ামি বিমান বন্দরে তিঁনি একটা কাজ পেয়ে যান। সেখানে যুদ্ধ ফেরৎ জ্যাক ফোর্ডের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁর কাছে অনেক বিষয় শেখার সুযোগ পান তিঁনি। যুদ্ধ বিমান এমনকি বোমারু বিমান কেমন করে চালাতে হবে, তাও শিখে যান। প্যারিসের এক প্রতিযোগিতায় তিনিই প্রথম মহিলা যিনি পুরস্কার জিতেন। লাইফ ম্যাগানিজ তখন লিখেছিলেন, 'Hundred most important young people in the USA'। সেখানে জেরি কব্-এর নাম ছিল। এই 'লাইফ' ম্যাগাজিনই তো পরে তাঁর উপেক্ষার বিষয়ে সোচ্চার হয়েছে। ফরাসি সরকারও তখন ওই ২১ বছরের মেয়েকে সম্মান জানায়।

দেশে ফিরলেন জেরি কব্। উইলিয়াম র‍্যানডল্ফের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন। তার পরের কাহিনী আগেই বলেছি। লড়াই করেও যখন তিনি হেরে যান, তখন আমেরিকার সরকার পরিচালিত স্পেস এজেন্সির চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। আমাজনের জঙ্গলে গিয়ে আদিবাসী মানুষদের বন্ধু হয়ে যান। প্রাইভেট পাইলট হিসাবে তাদের কাউকে কাউকে অনেক জিনিস শিখিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে, রাষ্ট্রপতি নিকসন তাঁকে পৃথিবীর সেরা পাইলটের পুরস্কার দিতে পারতেন। তাঁর দেশ যে ভুল করেছে, সেকথা কথাও বলছেন না। তাঁর নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য কয়েক বার মনোনীত হয়েছিল। আমাজানের গভীর অরণ্যের উপর দিয়ে মাইলেন পর মাইল পাড়ি দিয়েছেন জেরি, প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। অভিমানে ঝলসানো চাকচিক্য থেকে দূরে সরে গিয়ে অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে দিন কাটিয়েছেন।

দুই দেশ, সোভিয়েত ও আমেরিকা। ভেলেন্টিনা ও জেরির জীবন পড়ে আমরা কি ভালো মন্দ বুঝতে পারি না?

প্রবন্ধকার, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার : গ্রামীণ ফোন লিঃ, কোষাধ্যক্ষ প্রাগ্নিক বিজ্ঞানাগার কেন্দ্রীয় শাখা খুলনা।

ঘুমের ঔষধ ঃ শেফা বনাম নেশা

ডাঃ মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী

নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ; এই পৃথিবী কি কেবলই বিষাদময়ঃ

অনিদ্রার রাজ্যে পৃথিবী বিষাদময়। নানা শারীরিক রোগ, শোক, ব্যর্থতা, উদ্বিগ্নতা কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে উৎফুল্লতার অতিশয্য (মেনিয়া) অথবা চিন্তার বিভ্রান্তি (সিজোফ্রেনিয়া) বা সামাজিক ভীতিজনিত উদ্বিগ্নতায় অনিদ্রা যেন জীবনকে করে তুলে দুর্বিসহ। উপরোক্ত কারণসমূহের ফলে কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে অজানা কারণে মানব কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ু কাণ্ডের (যা ব্রেইন স্টীম নামে পরিচিত) রেটিকুলার এক্টিভিটিং সিস্টেম হয় উদ্দীপিত, ঘটে মানব অগ্রমস্তিস্কের পদদেশে কর্মের ব্যাপক ব্যঘাত। ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় জৈবস্নায়ু কেমিকেলের পরিমাণ ও কর্ম কৌশলে। এরই ফলশ্রুতি মানব সুখ হরণকারী অনিদ্রা।

আমাদের দেশে অনিদ্রায় ভুগতে থাকা মানুষের সংখ্যার সঠিক কোন পরিসংখ্যান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে বিভিন্ন হাসপাতালভিত্তিক কিংবা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের পাইভেট প্র্যাকটিসের জরীপ থেকে বুঝা যায় এর সংখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক। আমেরিকায় এক জরীপে দেখা যায় প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রায় ৩০ থেকে ৪৫ শতাংশ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে কিংবা স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে অনিদ্রায় ভুগেন। আবার আরেক জরীপে দেখা যায়, প্রাপ্ত বয়স্ক আমেরিকানদের প্রতি ৩ জনের একজন কোন না কোনভাবে নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত। আর দীর্ঘমেয়াদে নিদ্রাহীনতায় ভুগতে থাকা মানুষদের শতকরা ৫ ভাগ চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন। অপরদিকে শতকরা ৪০ ভাগ নিদ্রাহীনতায় ভুগতে থাকা মানুষ নিদ্রার জন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া নিজের থেকে নানা ঘুমের ঔষধ কিংবা অ্যালকোহল বা উভয়ই সেবন করে থাকেন। এক জরীপে দেখা যায় দিনের বেলায় অনিদ্রায় আক্রান্ত ব্যক্তির গাড়ি চালানোর সময় রোড ট্রাফিক অ্যাকসিডেন্টের মাত্রা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে দ্বিগুন।

নিদ্রার বড়ি যখন শেফাঃ

অনিদ্রার রাজ্যে জীবন যখন বিষাদের মরু, তখন তথায় নিদ্রার বড়ি যেন কিছুটা ছায়াময় মরুদ্যান। উদ্বিগ্নতা, বিষাদ, মনোবৈকল্যে যখন নিদ্রা প্রায় উবু-উবু, ঘুমের ঔষধই তখন একমাত্র ভরসা। কেবল নিদ্রা বা সম্মোহনকারকই নয়, বরঞ্চ অন্যদিকে উদ্বিগ্নতানাশক, মৃগীরোগ, মাংসপেশীর টান শিথীলকারক, আবেদনকারক বা আবেদনকারকের সহযোগী হিসেবে ঘুমের ঔষধের ব্যবহার অনস্বীকার্য। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক মাত্রায় ও যথাযথ সময়ব্যাপী ঘুমের ঔষধ এক উপকারী বস্তু। কিন্তু এক জরীপে দেখা যায়, দীর্ঘমেয়াদী অনিদ্রায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রায় ৪০ শতাংশই ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতিরেকে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে নেশার অন্যতম উপাদান হিসেবে এই ঔষধ ব্যবহার করেন। ঘুমের ঔষধের অযাচিত ব্যবহারই মানব শরীরে এর ক্ষতিকর প্রভাব কিংবা নেশার অন্যতম কারণ।

কখন বুঝবেন নিদ্রার বড়িতে আপনার নেশাঃ

সাধারণতঃ অধিক মাত্রায় ও দীর্ঘমেয়াদে (সর্বনিম্ন ৩ সপ্তাহের) ঘুমের ঔষধের অযাচিত ব্যবহারে ও এর প্রতি মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যদি ঘুমের সমস্যায় ঔষধের ব্যবহারে বিগত ১২ মাসে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো

দুই বা ততোধিক সংখ্যায় আপনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি আপনার জীবনের স্বাভাবিক গতিপ্রক্রিয়া হয় ব্যহত। কিংবা তা যদি আপনার নিকট অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখনই বুঝবেন ঘুমের ঔষধে আপনার নেশা।

সমস্যাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. যদি থাকে দীর্ঘমেয়াদে কিংবা/ এবং অধিক মাত্রায় ঘুমের ঔষধের ব্যবহারের ইতিহাস।

২. ঘুমের ঔষধ প্রাপ্তির আকাঙ্খা থাকবে সর্বদা কিংবা ঘুমের ঔষধ বন্ধ বা কমানোর প্রচেষ্টা হবে ব্যর্থ।

৩. জীবনের সিংহভাগ সময় ব্যয়িত হবে কেবল ঘুমের ঔষধ প্রাপ্তি, ব্যবহার কিংবা এর ক্রিয়াশীলতা থেকে মুক্তির জন্য।

৪. ঘুমের ঔষধের প্রতি থাকবে তীব্র আকর্ষণ।

৫. পুনঃপুন ঘুমের ঔষধের ব্যবহারে কর্মক্ষেত্র, স্কুল, কিংবা বাড়িতে নিজের দায়িত্বশীলতা হবে লুপ্ত কিংবা অপর্যাপ্ত।

৬. ঘুমের ঔষধের ব্যবহারের নানা মানসিক ও পারিবারিক সমস্যার ঘটনা যখন হয়ে দাঁড়াবে এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যপার।

৭. ঘুমের ঔষধের ব্যবহারে আপনার নানা সামাজিক, পেশাগত ও শখের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ হ্রাস বা লুপ্ত হবে।

৮. শরীরের ক্ষতি সত্বেও আপনি যখন নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাবেন ঘুমের ঔষধ সেবন।

৯. ঘুমের ঔষধের অযাচিত ব্যবহারে নানা শারীরিক ও মানসিক সমস্যা থাকা সত্বেও আপনি যখন ব্যর্থ হবেন ঘুমের ঔষধ সেবন না করা থেকে।

১০. যখন ঘুমের ঔষধের ক্রমাগত ব্যবহারে আপনার শরীরে একই ডোজে ঔষধের ক্রিয়াশীলতা ক্রমাগত হ্রাস পাবে কিংবা একই পরিমাণ ক্রিয়াশীলতা পেতে প্রয়োজন হবে অপেক্ষাকৃত উচ্চমাত্রায় ঘুমের ঔষধের।

১১. দীর্ঘ মেয়াদে কিংবা/ এবং অধিক মাত্রায় ঘুমের ঔষধ ব্যবহারের পর হঠাৎ করে তা বন্ধ করে দিলে আপনার শরীরে দেখা দিতে পারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। যথা- অত্যাধিক ঘর্মাক্ততা, হাতের কম্পন, নিদ্রাহীনতা, বমি বমিভাব, সাময়িক দৃশ্যমান, শ্রবণীয় বা স্পর্শীয় এক বা একাধিক প্রকারের অনুভূতি ভ্রম (Hellucination), শারীরিক অঙ্গে এক উত্তেজনাভাব, উদ্বিগ্নতা বা খিঁচুনি প্রভৃতি যা দুই বা ততোধিক সংখ্যায় উপস্থিত থাকতে পারে। যা সামাজিক, পেশাগত জীবনের আপনার জন্য অস্বস্তির কারণ। যা থেকে মুক্তি পেতে আপনাকে পুনঃপুন গ্রহণ করতে হবে ঘুমের ঔষধ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যা Withdrawal Syndrome নামে পরিচিত।

পরিত্রাণের আছে কি উপায়?

ঘুমের ঔষধ শেফা না নেশা তা নির্ভর করবে এর যথাযথ ব্যবহারের উপর। তাই ঘুমের ঔষধ যাতে নেশার খড়্গ হয়ে মানুষের জন্য ভীতির কারণ না হয় সেজন্য নিম্নলিখিত পন্থাসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

১. প্রয়োজন রোগ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। দূর করতে হবে অনিদ্রা সম্পর্কে সকল ভ্রান্ত ধারণা।

২. চাই অনিদ্রা আনয়নকারী সকল মনোসামাজিক ও পারিবারিক প্রভাবকের সঠিক নিরূপন। প্রয়োজনে তা থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করা।

৩. ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নয় ঘুমের ঔষধ।

৪. দীর্ঘমেয়াদে ঘুমের ঔষধ ব্যবহার থেকে থাকুন বিরত। কিংবা দীর্ঘমেয়াদে ঘুমের ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমিকভাবে এর মাত্রা ও ক্রম কমানো মাধ্যমে তা বন্ধ করুন।

৫. প্রয়োজন অনিদ্রা সৃষ্টিকারী সকল শারীরিক ও মানসিক রোগের সঠিক চিকিৎসা। এ ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ চিকি/সক প্রধান পরামর্শক হতে পারে।

৬. অনিদ্রার চিকিৎসায় প্রাথমিক পর্যায়ে ঘুমের ঔষধের ব্যবহারের পরিবর্তে গুরুত্ব দেয়া উচিত নানা মনোচিকি/সা ব্যবস্থা পদ্ধতিকে। বর্তমানে অনিদ্রার চিকিৎসায় নানা প্রকার মনোচিকিৎসা পদ্ধতি যেমন- কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপী (Cognitive Behavioural Therapy), সার্বজনীন ঘুম সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধি (Universal Sleep Hygiene), অনিদ্রার আনয়নকারী ফ্যাক্টরসমূহের নিয়ন্ত্রণ (Stimulus Control Therapy), ঘুমের নিয়ন্ত্রণ (Sleep Restriction Therapy), রিলাক্সেশন থেরাপী (Relaxation Therapy), বা বায়োফিডব্যাক (Biofeedback), কগনিটিভ ট্রেনিং (Cognitive Training), প্যারাডক্সিকেল ইন্টারভেনশন প্রভৃতি এক বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে একজন মনোচিকিৎসক কিংবা একজন মনোবিদ হতে পারে প্রধান সহায়ক। এক গবেষণায় দেখা যায় এ সমস্ত মনোচিকিৎসা পদ্ধতি এককভাবে কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে ঘুমের ঔষধের সাথে অনিদ্রার চিকিৎসায় খুবই কার্যকরী। এইসব চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার একদিকে কমিয়ে আনতে পারে কিংবা অন্যদিকে ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে পারে ঘুমের ঔষধের ব্যবহার। সেই সাথে অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারে ঘুমের ঔষধে নেশাগ্রস্তের সংখ্যা।

৭. কমিউনিটি তথা তৃণমূল পার্যায়ে নেশার চিকিৎসায় গড়ে তুলতে হবে এক বা একাধিক সামাজিক মনোচিকিৎসা প্রদানকারী গ্রুপ।

৮. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইন প্রয়োগ করে ঘুমের ঔষধের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহারে আনতে হবে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ।

৯. জাতীয় ও সামাজিক পর্যায়ে ঘুমের ঔষধ ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্বন্ধে সৃষ্টি করতে হবে ব্যাপক জনসচেতনতা।

১০. ঘুমের ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে স্বাস্থ্য প্রশাসন, ঔষধ প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী প্রশাসনের কার্যক্রমের মধ্যে প্রয়োজন ব্যাপক সমন্বয়তা।

১১. ঘুমের ঔষধের নেশার চিকিৎসায় আন্তর্জাতিক কিংবা সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকরী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সমন্বিত কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১২. প্রয়োজন নেশাগ্রস্তদের পুনর্বাসনে আরও অধিক জোরালো কার্যক্রম। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নানা সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের ব্যাপক সমন্বয়।

প্রবন্ধকার, মেডিসিন ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ, ইমার্জেন্সী মেডিক্যাল অফিসার, জাতীয় মানসিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী ও তাদের সংরক্ষণ

আমিনা বেগম

প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিটি প্রাণীর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ প্রতিটি প্রাণী তার নিজের পরিবেশের একটি অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় অংশ। বন্যপ্রাণী একে অন্যের সঙ্গে জড়িত এবং উভয়ই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বন্যপ্রাণী প্রকৃতির যেমন শোভা বর্ধন করে তেমনি মানুষের দৈনন্দিন তথা জাতীয় জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়। বিগত কয়েক দশকে মানুষের বিভিন্ন হস্তক্ষেপের ফলে অনেক বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অনেকে বিলুপ্তির দাড়গোড়ায় পৌছেছে। তবে মানুষের মঙ্গলের জন্যই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং শক্তিচক্রকে অব্যাহত রাখতে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বাংলায় বন্যপ্রাণীয় শব্দটি ইংরেজী Wild Life শব্দ হতে এসেছে। বন্যপ্রাণী বলতে সাধারণত সেসব প্রাণীকে বুঝায় যারা গৃহপালিত নয়, যারা আশ্রয় ও খাদ্যের জন্য মানুষের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যারা প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাধীনভাবে খাদ্যগ্রহণ, বসবাস ও প্রজনন করতে পারে। এসব প্রাণী নিজেরাই আত্মরক্ষার কৌশলরপ্ত করে এবং সকল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাও রাখে। Mc Graw-Hill Encyclopedia of Science and Technology (1960) তে বন্যপ্রাণীকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। Wildlife in a restricted sense refers to undomesticated warm blooded vertebrates, or wild mammals and birds. আর বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী বলতে সে সব প্রাণীকে বুঝায় যারা বিলুপ্তি ঝুকিমাত্রার চরম সীমায় রয়েছে এবং যারা অতি শীঘ্রই বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পতি IUCN বাংলাদেশ কর্তৃক বাংলাদেশ ৮৮৯টি প্রজাতির বন্যপ্রাণীর তালিকা প্রকাশ করে যেখানে ২২টি উভচর, ১২৬টি সরীসৃপ, ৬২৮টি পাখি এবং ১১৩টি স্থন্যপায়ীর কথা বলা হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে ব্যাপকহারে বন্যপ্রাণী নিধন, আবাসস্থল ধ্বংস, পরিবর্তন, সাধারণ জনগণের মধ্যে জনসচেতনতার অভাব ইত্যাদি কারণে অনেক প্রজাতি হুমকির সম্মুখীন। বর্তমানে উভচর ২২টি প্রজাতির মধ্যে ৮টি হুমকিগ্রস্থ। এদের মধ্যে অন্যতম হলো সবুজ ব্যাঙ, পটকা ব্যাঙ, বড় গাছ ব্যাঙ ও সোনা ব্যাঙ আর সরীসৃপের মধ্যে ১২৬টি প্রজাতির ৬৩টি প্রজাতির হুমকিগ্রস্থ তথা বিলুপ্ত প্রায়। বিলুপ্ত প্রায় অন্যতম সরীসৃপগুলো হল লোনা পানির কুমির, ঘড়িয়াল, কাছিম, উড়ন্ত টিকটিকি, চন্দ্রবোড়া, বড় কাইট্রা, প্রভৃতি। পাখিদের মধ্যে ৬২৮টি প্রজাতির মধ্যে ৪৭টি প্রজাতি বিলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এদের মধ্যে কালো তিতির, জলার তিতির, কাঠময়ূর, বাদিহাঁস, বুঁচাহাঁস, রাজ হাঁস, পাহাড়ী নিলকণ্ঠ, হরিয়াল কুরা, রঙ্গিলা বক প্রভৃতি অন্যতম। স্থন্যপায়ী ১১৩টি প্রজাতির মধ্যে ৪৩টি প্রজাতি আজ হুমকির সম্মুখীন। এগুলো হল লজ্জাবতী বানর, পাতি শেয়াল, মেছো বাঘ, চিতা বাঘ, ভোদড়, ভাল্লুক, শুশুক, হাতি, সাম্বার, মায়া হরিণ, বন ছাগল, বনরুই অন্যতম। এ সকল বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর অবিলুপ্তির কারণ চিহ্নিত করে আশু সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে একসময় বাংলাদেশ হতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে একসময় সবুজ শ্যামল ও জীবজন্তুতে ভরপুর ছিল। নির্দিষ্ট বনভূমি ছাড়াও এদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছোট বড় বন জঙ্গল বা ঝোপঝাড় ছিল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিনিয়ত বন জঙ্গল কেটে চাষাবাদের জমি তৈরী করা হচ্ছে। এছাড়া নগরায়ন, রাস্তাঘাট তৈরী, বনজ সম্পদের অতি ব্যবহার, অদূরদর্শী ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কারণে বনাঞ্চল সংকুচিত হওয়ায় বন্য প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। মানুষ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বন্যপ্রাণীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হত্যা বা ধ্বংস করে চলেছে। বন্যপ্রাণীর খাদ্যের উৎস, আবাস্থল পরোক্ষভাবে ধ্বংস করেছে। এছাড়া মাংসের লোভে, শখের বসে, লোকজ ঔষধ তৈরীর জন্য, শৌর্যবীর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য, শিকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে বন্যপ্রাণী ধ্বংস করেছে। মানুষের এসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে অনেক প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে আজ যে সমস্ত বন্যপ্রাণী বাংলাদেশে রয়েছে অথবা বিলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা একান্ত দরকার। অন্যথায় অনেক দূর্লভ প্রজাতির প্রাণী অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ১৯৭৩ সালের ২৩শে মার্চ বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) জারিকৃত অধ্যাদেশ মতে বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণী শিকার নিষিদ্ধ করা হয় এবং এই আইন অমান্যকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নিমিত্তে কতিপয় বাস্তব কর্মপন্থা প্রনয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। নিম্নে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলঃ

১. বনভূমিকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং মানুষের যাবতীয় হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষণ করা।

২. অনেকে সখ করে বা খেলা দেখানোর জন্য বন্যপ্রাণী ধরে রপ্তানি করে। এছাড়া বন্যপ্রাণীর শিং মাংস, চামড়া, পালক, অস্থি ইত্যাদির জন্য প্রাণীদের অবৈধভাবে হত্যা করা হয়। এভাবে বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণী অবাধে হত্যা, ধরা, শিকার করা বা রপ্তানী করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩. বন্যপ্রাণীজ যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন- শিং, চামড়া, মাংস, পালক, অস্থি ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪. বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা পরিষদ গঠন ও জরিপকার্যক্রম চালানোর মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা, বংশবৃদ্ধির হার, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে যথাযথ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা উচিত। ইহার ফলে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সহজে বুঝা যাবে।

৫. স্বতন্ত্রভাবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কর্মকান্ড চালানো সহজ হবে।

৬. বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর জন্য কঠোর অধ্যাদেশ সরকারের পক্ষ হতে জারি করতে হবে যাতে মানুষ কোনক্রমেই উহাদের ধরতে বা শিকার করতে না পারে।

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালের ২৩শে মার্চ বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী অধ্যাদেশ জারি করেন। এ আইন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ দরকার।

৮. যে সকল বন্যপ্রাণী আমাদের দেশে ছিল এখন বিলুপ্ত এইসব প্রাণীকে বিদেশ হতে আমদানী করতে হবে এবং এদেরকে বনভূমিতে অবাধ বিচরনের সুযোগ করে দিতে হবে।

৯. পর্যাপ্ত সংখ্যক অভয়ারন্য, জাতীয় পার্ক, সংরক্ষিত বনভূমি ইত্যাদি চিহ্নিত করা এবং তার সংরক্ষণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. বন্য প্রাণী যে পরিবেশের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এদের যে যথেষ্ঠ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা।

বন ও বন্যপ্রাণী প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ। বন যত গভীর হয় বন্যপ্রাণী তত শান্ত পরিবেশে বাস করতে পারে। বনে বাস করে বন্যপ্রাণী এবং সমতল ভূমিতে বাস করে বন্যপাণী ও মানুষ। সুতরাং বন্যপ্রাণীর সাথে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আর এই বন্যপ্রাণী মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই যে সকল বন্যপ্রাণী অবলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে তাদের সুষ্ঠ পরিবেশ ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ফলে এ সকল বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীকে যেমন বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করা যাবে তেমনি আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা যাবে।

Ref: (1) Red Book of Threatened Animals of Bangladesh-IUCN.

(২) বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী, ডঃ আলী রেজা খান।

প্রবন্ধকার, বি.এস.সি (সম্মান) ১ম শ্রেণী, এম.এস.সি ১ম শ্রেণী, প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ, মৌলানা মুফজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রি কলেজ, রাজনগর, মৌলভীবাজার।

ক্যামিকেল দিয়ে পাকানো আম ধ্বংস, বাস্তবতা ও করণীয়

ড. মো. শরফ উদ্দিন

মধুমাসের সবচেয়ে সুস্বাদু ও জনপ্রিয় ফল হচ্ছে আম। এদেশে বর্তমানে যে ৭০টি ফল বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে তার মধ্যে আম সবচেয়ে পছন্দনীয় ফল। সুমিষ্ট স্বাদ, মন মাতানো ঘ্রান ও পুষ্টিমান সব কিছু বিবেচনায় আম হচ্ছে সেরা। আবহাওয়াগত কারণে সারাবছর আম এদেশের বাজারে পাওয়া যায় না। যদিও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্প্রতি বারি আম-১১ নামে আমের একটি বারোমাসী জাত উদ্ভাবন করেছে। এই উদ্ভাবিত জাতটি বছরে তিনবার ফলন দিচ্ছে। এই জাতটির চাষাবাদ যত দ্রুত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে তত দ্রুত আম পছন্দকারী ভোক্তাগণ তাদের হাতের নাগালে আম পেতে পারেন। বিজ্ঞানিদের ধারণা এই জাতের আম বাজারে ভালোভাবে আসতে আরও ৫ বছর সময় লাগতে পারে। এদেশে সাধারণত মে মাস হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আম বাজারে থাকে এবং ভোক্তাদের হাতের নাগালে থাকে। তবে বর্তমানের ব্যাগিং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে আম প্রাপ্তির সময়কাল দীর্ঘায়িত হয়েছে। এখন নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেও আশ্বিনা আম বাজারে পাওয়া যায়। এই আম বেশ ভালো দামেই কেনা-বেচা হচ্ছে। প্রতি কেজি আমের দাম ৪০০-৭০০ টাকা যা আমচাষীরা কখনও চিন্তা করেননি বা স্বপ্নেও ভেবে দেখেননি। নাবী এই আশ্বিনা আমের দাম বেশি হওয়ায় সাধারণত ক্রেতাগন না কিনে শুধুমাত্র দেখেই তৃপ্ত হন।

একজন ক্রেতার বা ভোক্তার আম যতই পছন্দের হোক না কেন, মে মাসের আগে নামিদামি জাতের আমগুলো খাওয়ার তেমন সুযোগ নেই বা পেলেও খাওয়া ঠিক হবে না। তবে গুটি জাতের আম বাজারে আসতে পারে যেমন বৈশাখী, রাজবৈশাখী ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সময়ে কিছু ভারতের অরিপক্ক এবং কম স্বাদযুক্ত আম বাজারে দেখা যায় এবং এক শ্রেণির ক্রেতাগন আগ্রহভরে কিনতে থাকেন এই আমগুলি। এই আমগুলোর দামও বেশি, ১২০-১৫০ টাকা প্রতি কেজি কেনা-বেচা হতে দেখা যায়। এই আমগুলো না খাওয়াই উত্তম। এদেশের অনেকগুটি জাত আছে যেগুলো এপ্রিল মাসের শেষের দিকে পুষ্ট হয় এবং হরমোনের ব্যবহার করে ভারতের আমের সময়েই পাকানো যায়। কিন্তু স্বাদের ও পুষ্টিমানের কথা বিবেচনায় এখনও বাণিজ্যিকভাবে জোর করে আম পাকানোর বৈধতা দেওয়া হয় নাই। তবে, ভারতের অপরিপক্ক আম আমদানির চেয়ে আমাদের দেশে স্বল্প পরিসরে ইথাইলিন চেম্বার করে আম পাকানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশী আমের প্রাপ্যতা আরও এক মাস বাড়তে পারে। এদেশের প্রথম বাজারে আসে সাতক্ষীরা জেলার আম। এই জেলার গোবিন্দভোগ আমটির মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিপক্কতা আসে। এরপর গোপালভোগ, হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলি ও বারি আম-৩ (আম্রপালি) জাতের আম বাজারে আসে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গোবিন্দভোগ ও গোপালভোগ আম সাতক্ষীরা হতে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমের পরিমান কম হওয়ায় চাহিদা অনেক বেশি থাকে। এই সুযোগটা ভালোভাবেই কাজে লাগান এই অঞ্চলের আমচাষীরা ও আম ব্যবসায়ীরা। ভালোভাবে হিমসাগর আম পরিপক্ক না হলেও একটু বেশি দাম পাওয়ার আশায় আগাম বাজারজাত করে থাকেন। এই অপরিপক্ক আমগুলো এমনিই পাকতে চায় না। তারপরও ব্যবসায়ীরা ইথোফন/কার্বাইড ব্যবহার করে জোর করে পাকানোর চেষ্টা করেন বা করে চলেছেন। আর সমস্যাটির শুরু এখানেই। সাতক্ষীরা জেলার ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়াগত কারণে আম পাকবে সবচেয়ে আগে। কিন্তু তারমানে এই নয় যে, হিমসাগর আম পাকবে মে মাসের ১০ তারিখ হতে। গবেষণায় দেখা গেছে, মে মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত হিমসাগর আমের আটিই ভালোভাবে শক্ত হয় না। তবে বিগত

কয়েকবছর পর্যাপ্ত তথ্য না থাকার কারণে আম গবেষকরা এই বিষয়ে তেমন কোন মতামত দেননি। তবে বর্তমানে গবেষনায় দেখা গেছে, বিভিন্ন জাতের আম সংগ্রহের সময়ে তারতম্য হচ্ছে। যেমন, ২০১৭ সাল পর্যন্ত ধারণা করা হতো সাতক্ষীরা জেলার হিমসাগর আম মে মাসের ১০-১৫ তারিখের মধ্যে পরিপক্কতা আসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে, এরচেয়ে আরও ১০ দিন পরে পরিপক্কতা আসছে। ফলে এই সময়ের আগে যেন এই জাতটি সংগ্রহ করা না হয় সেইদিকে স্থানীয় প্রশাসনকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই তথ্যটি বের করতে বিজ্ঞানিরা সময় নিয়েছেন তিনটি বছর। এখন বিজ্ঞানিরা নিশ্চিত হয়েছেন, কোন জাতের আম পরিপক্কা হতে কতদিন সময় লাগে, জেলার অক্ষাংশ বিবেচনায় কোন জেলার কোন জাত কখন পাকবে ইত্যাদি। সেই ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফল বিজ্ঞানিরা সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ আম উৎপাদনকারী জেলার বিভিন্ন জাতের আম পরিপক্কতার সম্ভাব্য সময়কাল নির্ধারণ করেছেন যা অনুসরণ করলে আমচাষী, আম ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সকলেই উপকৃত হবেন। মৌসুমের শুরুতে প্রতি বছর অনেক আম বিভিন্ন অযুহাতে নষ্ট বা ধ্বংস করা হয় যেটি কৃষি সংশ্লিষ্ট কারও কাম্য নয়। সুতরাং আগাম আম উৎপাদনকারী জেলাগুলোতে আম সংগ্রহের সময় অনুসরণ করে নজরদারি বাড়ালে সুফল মিলবে এমনটিই মনে করেন আম বিজ্ঞানিরা। ভোক্তাদের জন্য একটি সুখবর হলো, ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত আমগুলো নিরাপদ, বিষমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানিযোগ্য রাখা সম্ভব। সুতরাং এই প্রযুক্তিটির ব্যবহার মাঠ পর্যায়ে যতবেশি বাড়বে ততই ভোক্তাদের ঝুঁকি কমবে।

জাতভিত্তিক আম পরিপক্কতার সম্ভাব্য সময়কাল

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আমের জাতের ভিন্নতা অনুযায়ী আম পরিপক্কের সময়						
		গোবিন্দভোগ/ গোপালভোগ	হিমসাগর/ খিরসাপাত	ল্যাংড়া, বোম্বাই/বারি আম-২	ফজলি	বারি আম-৩ *রাঙ্গুয়াই	হাড়িভাঙ্গা	আশ্বিনা
০১	বান্দরবন, রাঙ্গামাটি	প্রযোজন্য নয়	প্রযোজন্য নয়	প্রযোজন্য নয়	প্রযোজন্য নয়	জুন মাসের ২য় সপ্তাহ *৩য় সপ্তাহ	প্রযোজন্য নয়	প্রযোজন্য নয়
০২	সাতক্ষীরা, খুলনা/ খাগড়াছড়ি	১০ মে	২০ মে	২৮ মে	১২ জুন	১৫ জুন	প্রযোজন্য নয়	প্রযোজন্য নয়
০৩	যশোর, মেহেরপুর, ঝিনাইদাহ, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া	১২ মে	২৫ মে	০৩ জুন	১৫ জুন	১৮ জুন	প্রযোজন্য নয়	প্রযোজন্য নয়
০৪	পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নওগাঁ, রাজশাহী	২৫ মে	৩০ মে	৭ জুন	১৭ জুন	২২ জুন	প্রযোজন্য নয়	১০ জুলাই
০৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ (পোরশা, সাপাহার)	২৭ মে	০৪ জুন	১২ জুন	২০ জুন	২৫ জুন	প্রযোজন্য নয়	১৫ জুলাই
০৬	রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, পঞ্চগড়	২৯ মে	৭ জুন	১৪ জুন	২২ জুন	২৭ জুন	১৫ জুন	২০ জুলাই

* আবহাওয়াগত পরিবর্তনের কারণে জাতসমূহের সংগ্রহের সময়ে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। নির্ধারিত তারিখের পূর্বে আম পরিপক্ক হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি কর্মকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করে আম সংগ্রহ ও বাজারজাত করা যাবে।

এছাড়াও পরিপক্ক আম চেনার কয়েকটি সহজ উপায় আছে। যেমন: সকাল বেলায় ২/১টি পাকা আম গাছের নিচে পড়ে থাকবে এবং পরিপক্ক আম পানিতে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যাবে।

আমচাষীরা যেভাবে উপকৃত হবেন

আম গাছে থাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। কোন ভাবেই বা কোন কিছু প্রয়োগের মাধ্যমে আম দীর্ঘদিন গাছে রাখার কোন সুযোগ নেই। আমের গুটি বাধার পর ধারাবাহিকভাবে আম বড় হতে থাকে এবং আমের ওজন বাড়তে থাকে এবং শেষের সময়ে এই ওজন বৃদ্ধির হার পূর্বের চেয়ে বেশি। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩-৫ গ্রাম করে ওজন বাড়তে থাকে। এটি একটু বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোধগম্য হবে। হিমসাগর আম ৪০ কেজি হতে প্রয়োজন হয় প্রায় ১৭০টি আমের। প্রতিদিন যদি ৩ গ্রাম ওজন বাড়ে তাহলে মোট ওজন বাড়বে প্রায় ৫০০ গ্রাম। আর যদি ৫ গ্রাম ওজন বাড়ে তাহলে মোট ওজন বাড়বে ৮৫০ গ্রাম। তাহলে একজন চাষী যদি ৭ দিন পর আম সংগ্রহ করেন তাহলে প্রায় প্রতি ৪০ কেজির (এক মণ) জায়গায় ৪৬ কেজি আম সংগ্রহ করবেন। এইভাবে একটি গাছে যদি ১০ মণ আম ধরে এবং সঠিক সময়ে সংগ্রহ করলে ১১.৫ মণ আম সংগ্রহ করতে পারবেন। অর্থাৎ একটি মাঝারি আম গাছ হতে ৩-৪ হাজার টাকা বেশি পেতে পারেন।

ব্যবসায়ীরা যেভাবে উপকৃত হবেন

অপরপিক্ক আম কেনার পর পাকানোর জন্য অস্থির হয়ে থাকেন আম ব্যবসায়ীরা। ব্যবহার করেন ইথোফোন/কার্বাইড। এরপরও অনেক আম পচে নষ্ট নয়। ভোক্তারা আম খাওয়ার পর সন্তুষ্ট থাকেন না ফলে ব্যবসার সুনাম নষ্ট হয়। পরিপক্ক আম বাজারজাত করলে কোন ঝুঁকি থাকেনা। আমগুলো অনেক আস্তে পাকে এবং সংগ্রহোত্তর ক্ষতি অনেক কমে যায়। এই জাতীয় পরিপক্ক ও পুষ্ট আম কিনে ও খেয়ে ক্রেতারা সন্তুষ্ট থাকেন এবং ব্যবসার সুনাম বাড়তে থাকে। অর্থাৎ আমের ব্যবসা লাভজনক হয়।

ক্রেতা/ ভোক্তারা যেভাবে উপকৃত হবেন

ভোক্তাদের আম বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা থাকে না। প্রতিটি জাতের আম থেকে কাঙ্ক্ষিত স্বাদ পেতে থাকেন এবং আম খাওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে। ক্রয়কৃত আম নষ্ঠের পরিমান অনেক কমে যায়।

পরিশেষে, আমচাষীদের কষ্টের আম যেন অযথা নষ্ঠ না হয় সেই দিকে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে। ঢাকায় নয় উৎপাদনকারী এলাকাতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশের সকল ক্রেতাদের জন্য সহজলভ্য ও সহজপ্রাপ্য হোক দেশীয় এই জনপ্রিয় ফলটি, এমনটিই প্রত্যাশা ফল বিজ্ঞানিদের।

প্রবন্ধকার : উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাপাইনবাবগঞ্জ।

বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান স্বাক্ষরতা

ড. আমানুল ইসলাম

সুকুমার রায়ের কবিতা 'বিজ্ঞান শিক্ষা' বোধ হয় আমাদের অনেকের পড়া। কবিতার কয়েকটি পংক্তি এরকম:

"আয় তোর মুন্ডুটা দেখি, আয় দেখি 'ফুটোস্কোপ' দিয়ে,

দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।

.....

মুন্ডুতে 'ম্যাগনেট' ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্ট' করে,

ইট দিয়ে 'ভেলসিটি' কষে দেখি মাথা ঘোরে কিনা ঘোরে।"

এ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে কি কোন ধারণা পাওয়া যায়? হয়তো যায়, হয়তো যায়না। আসলে জগৎ এবং জীবনকে জানবার, ধারাবহিক পদ্ধতিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ শিক্ষার মধ্য দিয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার ধারা ও প্রয়োগপদ্ধতি আয়ত্ত্ব করতে পারাই বিজ্ঞান শিক্ষা। বিজ্ঞান শিক্ষা মানুষকে যৌক্তিক ভাবে চিন্তা করতে শেখায়। প্রশ্নশীলতা ও চিন্তাশীলতার বিকাশ ঘটায়। প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীকে অধীত বিদ্যার পরিপূর্ণ ও যথার্থ ব্যবহারের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান মনস্কতার রয়েছে গভীর সম্পর্ক। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তাকে ভালোভাবে বুঝতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানমনস্কতা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানমনস্ক জাতিই উন্নতির পথে বাধাগুলো অপেক্ষাকৃত সহজে অতিক্রম করতে পারে। আর এজন্যই ব্যাপকভাবে যথার্থরুপে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার দরকার। শুধু তথ্য ও জ্ঞানার্জনই বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা (যেটি বিজ্ঞান সাক্ষরতা হিসেবে পরিচিত) অর্জন। 'সবার জন্য বিজ্ঞান'- ধারণার সাথে সবার বিজ্ঞান সাক্ষরতা অর্জন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিজ্ঞান সাক্ষরতা শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও এ বিষয়ে পরিষ্কার রূপরেখা দীর্ঘদিন পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায়নি। বিজ্ঞান শিক্ষা কেন দেয়া হচ্ছে সেটা বিবেচনায় নিলে বিজ্ঞান সাক্ষরতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা (Scientific literacy) শব্দটি ব্যবহার হওয়া শুরু হয় ১৯৫০ সালের শেষার্ধ থেকে। স্থানভেদে বিজ্ঞান সাক্ষরতার বোঝাপারাতে রকমফের রয়েছে। যেমন- ব্রিটেনে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা বলতে গণমানুষের বিজ্ঞানকে বুঝতে পারাকে বোঝানো হয়। আবার ফ্রান্সে বোঝানো হয়ে থাকে বিজ্ঞান সংস্কৃতিকে। সাধারণভাবে বিজ্ঞান সাক্ষরতা বলতে অনেকের ধারণা, এটি হচ্ছে বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানা। আদতে বিজ্ঞান সাক্ষরতা এর চাইতেও বেশি কিছু। বিজ্ঞান সাক্ষরতার দুটি দিক রয়েছে- একটি হচ্ছে চিন্তায় এবং অপরটি হচ্ছে কর্মে বৈজ্ঞানিক মেজাজের উপস্থিতি। প্রয়োজনানুগ বিজ্ঞান বিষয়ের ধারণা থাকা ও তার চর্চা করা এবং জ্ঞানের ব্যবহার বা নতুন জ্ঞান সৃষ্টির মাধ্যমে বিজ্ঞানে সম্পৃক্ত থাকার নাম

হচ্ছে বিজ্ঞান সাক্ষরতা। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান থাকা হচ্ছে বিজ্ঞান সাক্ষরতার একটি ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর মানুষ:

- চারপাশের জগতের প্রতি আগ্রহী থাকে এবং তাকে বুঝতে পারে

- বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় সম্পৃক্ত থাকে

- প্রশ্নগুলোকে সনাক্ত করতে, অনুসন্ধান চালাতে ও প্রমাণ ভিত্তিক উপসংহার টানতে সক্ষম থাকে

- বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অন্যদের দাবীর প্রতি সংশয়ী থাকে ও প্রশ্ন করে

- পরিবেশ, নিজ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির বিষয়ে ওয়াকিবহাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতাকে অনেকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। ট্রেফিল বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতার কার্যকরী সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা হচ্ছে আমাদের চিন্তাভূমিতে, সংবাদে বা যেকোন স্থানে আগত বিভিন্ন বিচার্য বিষয়ের মোকাবেলায় ভৌত বিশ্বকে যথেষ্ট পরিমাণে বুঝতে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের গর্ভ বা ছাঁচ। হারলেন বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে,"বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা হচ্ছে বিজ্ঞানের মুখ্য ধারণাগুলোকে সার্বিকভাবে বুঝতে পারা, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সেই ধারণাগুলোকে প্রয়োগ করতে পারার সক্ষমতা, এবং বৈজ্ঞানিক কার্য ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহজাত গুণাবলীর যে শক্তি আর সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাকে বুঝতে পারা।"

শেন (১৯৭৫) তিন ধরনের বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতার কথা প্রস্তাব করেছেন। এগুলো হলো- (১) ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা, যেখানে জীবনযাত্রাকে উন্নত করতে বৈজ্ঞানিক নীতি ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়; (২) সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা, যেখানে মানুষের মুখ্য অর্জন হিসেবে বিজ্ঞানকে মর্যাদা দেয়া হয়; এবং (৩) নাগরিক বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা, সমসাময়িক বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিচার্যবিষয়ে ওয়াকিবহাল সম্পৃক্ততার জন্য প্রয়োজনীয় বোঝাপারার মাত্রা। সমাজবিজ্ঞানী ট্রেফিল ও জন মিলার এই তিনটি ধরনের মধ্যে নাগরিক বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতাকে বর্তমান আধুনিক যুগের মানুষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বিজ্ঞান সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা- ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর পর্যায়

বিজ্ঞান সাক্ষরতা অর্জন সমগ্র জীবনব্যাপী একটি প্রক্রিয়া। বাস্তব জীবনে মানুষের সামনে প্রতিনিয়তই সমাধানের জন্য অসংখ্য সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ এসে উপস্থিত হয়। বিজ্ঞান সাক্ষরতা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের ভিত্তি তৈরিতে সহায়তা করে। ভুল বোঝার সম্ভাব্যতা কমিয়ে প্রকৃত বিষয়টিকে স্বচ্ছ করে দেখার পথ সুগম করে দেয়। বিজ্ঞান সাক্ষরতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার উন্নতি ঘটায়। অনিশ্চিত নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতিতে মানুষের অসহায়তাবোধ ও উদ্বেগকে প্রশমিত করতে সাহায্য করে। মানুষ যখন জানতে পারে কোন ঘটনা কেন হয়, কী করলে কী ফল পাওয়া যায়, তখন কেউ তাকে প্রতারণা করতে পারেনা। মানুষ তখন কোন চিকিৎসা পদ্ধতি উপযুক্ত- ঝাড়ফুঁক নাকি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবে বা কোন খাবার স্বাস্থ্যসম্মত কিংবা সরকার গৃহীত কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড টেকসই কিনা, এরকম বিবিধ বিষয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর শৈশব থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান সাক্ষরতার বিকাশ ঘটলে জগৎটাকে

তার কাছে তত রহস্যময়, অজ্ঞেয়, অনিশ্চিত মনে হবেনা। বরং সে হয়ে উঠবে আত্মপ্রত্যয়ী। সীমাবদ্ধতা, গ্লানি থাকলে তাকে নিয়তি হিসেবে মেনে না নিয়ে সে তা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে।

মানুষের তথ্যের দরকার হয়। আবার তথ্য না পেলে গণতন্ত্র ঠিক মতো কাজ করতে পারেনা। কোন দেশকে এগিয়ে নিতে গেলে সেখানকার নাগরকিদের ওয়াকিবহাল সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সব খুঁটিনাটি বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক ও জনগণের উন্নয়ন বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে সর্বসাধারণের ওয়াকিবহাল সম্পৃক্ততা অত্যন্ত প্রয়োজন। একজন বিজ্ঞান স্বাক্ষর মানুষ এসব বিষয়ের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন থাকে। যেকোন ধরনের জ্ঞান কিংবা বিদ্যার প্রসার সাধনের সঙ্গে সমাজের যোগ অত্যন্ত নিবিড় এবং প্রত্যক্ষ। আরো গভীরতর অর্থে ওয়াকিবহাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানে সাক্ষর নাগরিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, জননীতি নির্ধারণ ও সামজিক পরিবর্তনে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সমাজের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখে। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানে সাক্ষরতা আমাদেরকে গোঁড়ামী, বর্ণবাদ, যৌন নিগ্রহ, সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে সহায়তা করে। সেইসাথে বাগড়ম্বর, অসার দাবী এবং অপবিজ্ঞান থেকে বিশ্বস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যউপাত্তকে পৃথক করতে সুযোগ করে দেয়।

বিজ্ঞান সাক্ষরতার পথে

পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য। ডেভিস (১৯৩৫) একজন বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করেছেন:

১. প্রমাণ সাপেক্ষে মতামত পরিবর্তনে ইচ্ছুক হবে।

২. ব্যক্তিগত, ধর্মীয় ও সামাজিক পূর্বসংস্কার বা মনগড়া কতগুলো ধারণা ব্যতিরেকে সামগ্রিক সত্য অনুসন্ধান করবে।

৩. কার্য-কারণ এবং প্রভাবের সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা থাকবে।

৪. প্রকৃত অবস্থা এবং তত্ত্বকে আলাদা করতে পারার সক্ষমতা থাকবে।

৫. কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান সাক্ষরতা শুধু পড়া বা লেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী কোন বিষয় নিয়ে ভাবার ও বিতর্কের সুযোগ পায়। উপাত্ত আর তথ্য উপস্থাপনের দক্ষতা অর্জন করে, অন্যদের সাথে নিজের যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

এবার দেখা যাক আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞান সাক্ষরতার সহায়ক কিনা। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১১ এ দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে বলা হচ্ছে: "প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান-শিক্ষা খুবই সেকেলে। আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের অপর্যাপ্ততা লক্ষণীয়। আমাদের স্কুলে প্রচলিত বিজ্ঞান পাঠ্যসূচি, বিজ্ঞান-শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, বিজ্ঞান-শিক্ষার পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্তমান সময়ের

বিজ্ঞান পাঠদানের প্রয়োজনীয়তার সহিত যথাযথভাবে সঙ্গতিপূণ নয়।.....বাংলাদেশে স্কুলে প্রচলিত বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসৃত হয়ে থাকে তা বিজ্ঞান পাঠদানের উদ্দেশ্যের সহিত যথাযথভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।" আমাদের দেশে স্কুল পর্যায়ে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে পরীক্ষার নম্বর তোলার জন্য তথ্য গলাধঃকরণের ওপর যতটা জোর দেয়া হয় সে তুলনায় বিজ্ঞানের মূল চরিত্র অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রকৃতির নিয়মের উপলব্ধি ও তার প্রয়োগ কুশলতা অর্জনের দিকে মনোযোগ অনেক কম। আর এ শেখাটা শেষ পর্যন্ত কারোরই কাজে আসেনা। ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান পড়ে বইয়ের পড়া হিসেবে। স্কুল কলেজগুলোতে আমাদের চারপাশের পরিবেশকে গভীরভাবে বোঝার অস্ত্র হিসেবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে কদাচিৎ শেখানো হয়। আর বর্তমানে যেকোন উপায়ে জিপিএ অর্জন শিক্ষার প্রধান বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশে পরিমাণগত বিস্তার যে কিছুটা ঘটেনি তা নয়। কিন্তু তা এখনো দেশের মননশীলতা, সংস্কৃতি ও বস্তুগত পরিবেশে গুণগত তেমন পরিবর্তন আনতে পারেনি। আমরা কেবল প্রযুক্তির ব্যবহারকারী। তাই এক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ সংস্কার ও পরিবর্তন প্রয়োজন। বিজ্ঞানের ধারণা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনকার সমস্যা সমাধানের শিক্ষাটা যাতে পায় সেজন্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্বেষণার আদর্শ প্রাথমিক স্তর থেকে সকল স্তরের শিক্ষাক্রমের অঙ্গীভূত হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষায় হাতে কলমে শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেজন্য বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো পরীক্ষা করে আর অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে শিক্ষার্থীদের হাতে পর্যাপ্ত উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষার বাইরে রয়েছে অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন পন্থা। যেমন- বিজ্ঞান জাদুঘর, বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান আয়োজন, প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়কে সব পর্যায় থেকে গুরুত্ব ও উৎসাহিত করতে হবে। আর সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্নস্তরে কি শিক্ষা পাচ্ছে, কিভাবে শেখানো হচ্ছে, সে শিক্ষা কতখানি শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারছে, যতটা তারা গ্রহণ করছে তাতে সমাজের উপর কতখানি কল্যাণকর প্রভাব পড়ছে এসবকিছু খতিয়ে দেখা জরুরী হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি সামজিক কাঠামোর বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। কেননা রাজনৈতিক সামাজিক অঙ্গনের পরিস্থিতির উপর এসব বাঞ্ছিত পরিবর্তন নির্ভরশীল।

সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সর্বজনবিদিত। পৃথিবীর সব জায়গাতেই সমাজের তরুণ ও নবীন সদস্যদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয় যাতে সে সমাজের পূর্ণ অংশীদার হতে পারে, মানুষের পূর্ণরূপে মানুষ হয়ে অবদান রাখার মাধ্যমে সমাজকে বিকশিত করতে পারে। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, একজন তরুণ যেন স্কুল জীবন শেষে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নয়, এক সুসঙ্গত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠে। বিশেষ জ্ঞান অর্জন নয়, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও নিজের বিচারক্ষমতা বিকশিত করাকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের সেই সুসঙ্গত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে কিনা, বিজ্ঞান সাক্ষর করে গড়ে তুলছে কিনা তা অবশ্যই গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখা উচিত। যদি আমরা বিশ্বাস করি জাতির অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের সে লক্ষ্যে তৈরি হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। যদি বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলোকে অর্জন করা যায় তাহলে আজকের এই শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে ওয়াকিবহাল সম্পৃক্ততার মাধ্যমে দেশগড়ায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্রবন্ধকার অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ঠিকানা: অনুসন্ধিৎসু চক্র, কেন্দ্রীয় কার্যালয়: ৪৮/১, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪ ।মোবাইল নম্বর: ০১৮১৯৯২৬১৬০। ইমেইল: progoti17@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১. Davis, I.C. 1935. The measurement of scientific attitudes. Science Education 19:117-122.

২. Harlen, W. 2006. Primary science education for the 21st Century. In W.Harlen (Ed.), ASE Guide to primary science education.

৩. Shen, B.S.P. 1975. Science literacy: public understanding of science is becoming vitally needed in developing and industrialized countries alike. American Scientist 63: 265-268.

৪. Trefil, J.S. 2008. Why science? Teachers College Press, New York and NSTA Press, Arlington, VA.

৫. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১১, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

অজানাকে জানাঃ অ্যারারুটের গল্প

ডঃ মিহির লাল সাহা

অ্যারারুট, হ্যাঁ অ্যারারুটকে নিয়ে আজকের লেখা। এই শব্দটি এবং শর্করাটির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে বাবার হাতে হালখাতা বা বার্ষিক হিসেবের খাতার মলাট বা কভার তৈরির সময়। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি এই ভেবে যে আমি আমার শৈশবে বাবা-মায়ের সাংসারিক প্রতিটি কাজের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে। হাতে কলমে অনেক কিছু শিখেছি যার অনেকগুলোই এখণ উদ্ভিদবিজ্ঞানে ছাত্র হিসেবে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি। আমার ছোটবেলা মানে অর্থাৎ সত্তুর দশকের কথা। আজ এই লেখাটির প্রয়োজনীয়তা কেন হলো? তার উত্তর দিয়েই অ্যারারুটের গল্পেই আসব। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে সকল বয়সের লোকজনই ইন্টারনেট ব্যবহার করে এটা নিশ্চিয়ই আমার সাথে একমত হবেন, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। সময় পেলে কম বেশি সকলেই ইন্টারনেটের বিভিন্ন বিষয় জানার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। আমার যদিও ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই তবে আমার ধারণা উঠতি বয়স থেকে শুরু করে সিনিয়র সিটিজেনও অবসর সময়ে ফেসবুকে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করেন। যেহেতু আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই সেহেতু আমি আমার অবসর সময় গুগুল সার্স ইঞ্জিন ব্যবহার করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় টুকিটাকি জানার চেষ্টা করি। সেই চেষ্টার ফসলই আজকের এই লেখা।

নিত্যদিনের মত কোনো একদিন বিকেলে আমার বাসার কক্ষে বসে ইন্টারনেটে বসে গুগুল ইঞ্জিন চেপে কোথায় যেন যেতে চেয়েছিলাম। যেখানে যেতে চেয়েছিলাম সেখানে যেতে পেরেছিলাম কিনা তা বলতে পারবো না তবে যেখানে গেলাম সেখানে অবশ্যই যেতে চায়নি এটা বলতে পারি। যখন গেলাম তখন তাকে গ্রহন করে যেটা পেলাম সেটার অনুভূতি সত্যিই অন্যরকম ছিল। আসলে ইন্টারনেটে বসে কি যেন খুঁজছিলাম, সেই খোঁজার ফাঁকে রুট ক্রপস নামে একটি শিরোনাম আমার সামনে ভেসে আসলো। আমি কেন যেন জানার লোভটি সামলাতে পারলাম না। সাথে সাথে ডাউনলোড করে নিলাম। সেখানেই পেলাম আমার অ্যারারুটের গল্প। এখন আসি গল্পের শিরোনামে। অজানাকে কেন শিরোনাম করলাম। তার উত্তর হলো আমি যাকে অ্যারারুটে জানতাম সেটি আসলে অ্যারোরুট। হয়ত শব্দ বিভ্রাটের কারণে বা অন্য কোনো কারণে অ্যারোরুটি আজ আমাদের কাছে অ্যারারুট নামে বেশি পরিচিত হয়ে এসেছে। এখন নিশ্চয়ই আমার এই শিরোনামটিতে কারো আর আপত্তি থাকবে না। এখন আসি সেই অ্যারোরুটবা অ্যারারুটের গল্পে। কেন এমন নাম হলো।

ভূমিকা সেরে এখন গল্পটি শুরু করা যাক। প্রথমেই অ্যারারুটের একটু পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে। অ্যারোরুট পাউডার হলো সাদা রঙের খুবই হালকা ওজনের মিহিদানার পাউডার। প্রাথমিকভাবে এই পাউডারটির উৎস হলো গ্রীষ্ম প্রধান দক্ষিণ আমেরিকার Marantaceae পরিবারভুক্ত Maranta arundinacea নামক উদ্ভিদের সঞ্চয়ী মূল বা রাইজোম। এই উদ্ভিদের রাইজোম থেকে যে স্টার্চ নামক শর্করা পাওয়া যেত সেটি হলো অ্যারারুটি পাউডার। এই পাউডারটির একটির একটি বিশেষত্ব ছিল। সেটি

হলো প্রাচীন কালে বিষাক্ত তীরের (Poisoned arrows) আঘাতের ক্ষতস্থান নিরাময়ে এটিকে ব্যবহার করা হতো বলেই এটি অ্যারোরুট নামে পরিচিতি লাভ করে। তাহলে কি দাঁড়াল? আমরা যে অ্যারারুট চিনি সেটি আসলে অ্যারোরুটি। রুট ক্রপস বা মূল জাতীয় ফসল নামক শিরোনামের ফসলের তালিকা যখন পড়ছিলাম তখন প্রথমে মনে হয়েছিল হয়ত এটির সঞ্চয়ী মূল দেখতে তীরের মত হয় বলে এটি অ্যারোরুট নামে পরিচিত। কিন্তু যখন ভিতরের বিষয়বস্তু ভালোভাবে পড়লাম তখনই আমার সে ভুলটিও ভাঙল। শুধু ভুলই ভাংলো তা নয় অ্যারারুট যে মূল থেকে তৈরি হয় সেটিও জানতে পারলাম। এভাবেই ইন্টারনেটের সুবাদেই অ্যারোরুট সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পেলাম। জানতে পেরে খুব ভালো লাগলো। এ গল্পটি আমি আমার মাস্টার্স-এর শিক্ষার্থীদেরকে সিলেবাসের বাহিরের বিষয়টি নিয়ে পাঠদান করেছি। জানিনা ঠিক করেছি কিনা? আসলে আমি যেটি জানি সেটিকে আমার নিজের মধ্যে আকড়ে ধরে না রেখে আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করতে খুব পছন্দ করি। এটি আমার একটি ব্যক্তিগত পছন্দ বলতে পারেন। জানিনা আমার এই পছন্দটিকে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা কিভাবে দেখে। তারা কি আসলে জানতে চায় নাকি জানানোর চেষ্টায় তারা বিরক্ত বোধ করে? যেহেতু অনুজীব নিয়ে একটু আধটু গবেষণা করি তাই এই ক্ষত নিরাময়ের বিষয়টি হয়ত কখনো গবেষণাগারে ক্ষতস্থান সংক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়ার ওপর পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছা রইল।

এখন আসি অ্যারারুটের ব্যবহারের বিষয়। গৃহিণীরা এবং খাদ্য প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান অ্যারোরুট সচারচর কর্ণস্টার্চ বা ভুট্টার শর্করার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আমি ছোটবেলায় আমার মাকে দেখেছি সূতির কাপোড়-চোপর সাবান দিয়ে পরিস্কার করার পর রোদে দেওয়ার পূর্বে অ্যারারুটি পানিতে মিশিয়ে উননে গরম করে কাপড়ে মাড় দেওয়ার কাজে। আবার কখনও দেখেছি রান্নার সময় মাছের তরকারি রান্না করার সময় রান্নার শেষ পর্যায়ে অ্যারারুট পানিতে মিশিয়ে মাছের ঝোলের সাথে মিশিয়ে ঝোলকে ঘন করার জন্য ব্যবহার করতে। আপনারা এটিকে কিভাবে ব্যবহৃত হতে দেখেছেন সেটি অবশ্য আমার জানা নেই। বানিজ্যিকভাবে কাপড়চোপড়ে যে মাড় দেওয়া হয় সেটি আবার জেনেছি আমার গবেষণা কাজের সময়। আমি যখন উচ্চতর গবেষণা কাজের জাপানে আমার অতি প্রিয় উতসুনোমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে গিয়ে টেক্সটাইল শিল্পের বর্জ্যপানি শোধনের ওপর কাজ করছিলাম। টেক্সটাইল শিল্পের বর্জ্যপানির কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড বা পানিতে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থ বিয়োজনে অক্সিজেনের চাহিদা যাকে আমরা সংক্ষেপে সিওডি (COD) বলে থাকি সেই সিওডি খুব বেশি হয় এবং এর কারণ হলো এই শিল্পে শ্বেতসার নামক জৈবরাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার। কাপড়কে সঠিক আকৃতি দিতে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা হয় যাকে টেক্সটাইল শিল্পে সাইজিং বলা হয়। আসলে সাইজিং হলো কাপড়ে মাড় দেওয়া, যেটি আমি ছোটবেলায় মাকে দেখেছি এই কাজটি করতে। এ কাজটি আমি আমার ছাত্রজীবনেও করেছি। বর্তমানে স্যুপ বা তরল জাতীয় খাবারকে ঘন করতে অ্যারারুটকে ব্যবহার করা হয়। অনেক ধরণের শ্বেতাসারই তরল জাতীয় খাবারকে ঘন করতে ব্যবহার করা হয় তবে অ্যারারুটের শর্করা অন্য যেকোনো শর্করা থেকে একটু ভিন্ন। অ্যারারুটের বিশেষত্ব হলো এটি অন্য শর্করার চেয়ে বেশ নিম্ন তাপমাত্রায় ঘন হয়। একারণেই তরল খাদ্য ঘন করার কাজে এর ব্যবহারও অনেক বেশি। বর্তমানে এটি ফলের জ্যাম-জেলি তৈরিতেও থিকেনার বা ঘনত্ব বৃদ্ধিকারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহার করলে ফলের জ্যাম-জেলি যেমন ঘন হয় তেমনই বেশ স্বচ্ছ হয় এবং জ্যাম-জেলির উজ্জ্বলতাও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এই শর্করা তরল জাতীয় খাদ্যকে

শুধু ঘনই করেনা সেই সাথে স্বচ্ছতা এবং উজ্জ্বলতাও দিয়ে থাকে যেটি আমরা গবেষণাগারে অ্যাগারের মধ্যে পেয়ে থাকি। বর্তমানে পুডিং, কাস্টার্ড, চকোলেট জাতীয় ডেজার্টে অ্যারারুট পাড়ার বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে বলে ভোক্তাদের ধারণা। অ্যারারুট একটি কম ক্যালরিভুক্ত শর্করা ফলে অধিক গ্রহণে মুটিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। প্রতি ১০০ গ্রাম ফ্রেশ অ্যারারুট সঞ্চয়ী মূল বা রাইজোম থাকে ৬৫ ক্যালটি শক্তি যা কিনা গোলআলু, কাসাভা, ইয়াম, ইত্যাদি থেকে কম ক্যালরি সম্পন্ন শর্করা। আমরা জানি শ্বেতসার শর্করা দুই ধরণের অ্যামাইলোপেকটিন ও অ্যামাইলোজ। অ্যারারুটের শর্করায় শতকরা ৮০ ভাগ অ্যামাইলোপেকটিন এবং ২০ ভাগ অ্যামাইলোজ থাকে। অ্যারারুট বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন বি, থায়ামিন, নায়াসিন সমৃদ্ধ একটি শর্করা। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের মিনারেল যেমন কপার, লৌহ, ম্যাংগানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস এবং ডিঙ্ক সমৃদ্ধ যা কিনা শরীরের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। যদিও অ্যারারুট একটি শ্বেতসার জাতীয় শর্করা তবুও এটিতে কোনো গ্লুটেন থাকে না। ইদানীংকালে শর্করাতে বিদ্যমান গ্লুটেনের প্রতি সংবেদনশীলতা বা অ্যালার্জিক বৈশিষ্ট্য অধীক হারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন। তাই গ্লুটেন বিহীন শর্করার কদর দিনে দিনে বাড়ছে। অন্য যে কোনো শর্করার তুলনায় অ্যারারুটে প্রোটিনের পরিমাণও বেশি থাকে। এখানে আবার গ্লুটেন সম্বন্ধে কিছু না বললে তো গল্পটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। গ্লুটেন হলো। কে ধরণের প্রোটিন, যেটি ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ যেমন গম, বার্লি, রাই, ওট ইত্যাদি শস্যের মধ্যে পাওয়া যায়। গ্লুটেন শব্দটির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে জাপানে পিএইচডি গবেষণার সময়। গ্লুটেন শব্দটি এসেছে 'গ্লু' নামক ল্যাটিন শব্দটি থেকে। 'গ্লু' অর্থ নিশ্চয়ই আপনাদের জানা, তবু ও বলছি 'গ্লু' অর্থ আঠা। এ প্রসঙ্গে অন্য একটি ছোট্ট গল্প না বললেই যা নয়। জাপানে থাকাকালীন সময় একদিন আমার গবেষণাগারের জাপানীদেরকে নিজ হাতে তৈরি করা আটার রুটি এবং মুরগীর মাংস খাইয়েছিলাম। আটা দিয়ে রুটি তৈরি করার সময় রুটিগুলো এমন ফুলেছিল যেন ঠিক লুচির মত। আমার বলতে লজ্জা নেই যে এই আমি স্বাধীনতা যুদ্ধর সময় জীবিকা নির্বাহের কারণে গ্রামের বাজারে রুটি বানিয়ে বিক্রি করতাম। আমি তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। সেখান থেকেই আমার রুটি তৈরির হাতেখড়ি হয়, যেটি এখনও আমি ভুলে যাইনি। এখনও যে কোনো পাকা রাধুনীর মতই রুটি বানাতে পারি। সেই রুটি তৈরি করার সময় জাপানী এক শিক্ষকের কাছেই রুটি ফোলার রসায়ন জানতে পারি। সে রসায়নে গ্লুটেন শব্দটি এসেছিল। আর গ্লুটেনের কারণেই নাকি গমের আটার মন্ডে স্থিতিস্থাপকতা দেয় এবং চুলায় ফ্রাইপ্যানে রুটি স্যাকার সময় ফুটে উঠে। চালের গুড়ায় গ্লুটেন থাকে না বলে চালের আটার রুটি আটার রুটির মত ফুলে না। গ্লুটেন আসলে কি সেটি নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে? গ্লুটেন হলো একটি সঞ্চয়ী যৌগিক প্রোটিন। এটি সাধারণত এন্ডোস্পার্ম বা শস্যের মধ্যে শ্বেতসারের সাথে এক সঙ্গে সঞ্চিত অবস্থায় থাকে। আশা করি আপনাদের অনেকের কাছে অজানা গ্লুটেনকে একটু হলেও জানাতে পেরেছি। অজানাকে জানাই যে আমাদের কাজ। তাইতো ধান ভানতে একটু শিবের গীত গাইলাম। গ্লুটেন প্রোটিন হওয়ায় অনেকের নিকট এটি অ্যালার্জির কারণ হতে পারে যেমন চিংড়ি মাছের প্রোটিনে অনেকের অ্যালার্জি হয়। যেহেতু অ্যারারুট গ্লুটেন বিহীন তাই এটি নিঃসন্দেহে একটি অ্যালার্জি মুক্ত শর্করা এবং সকলের কাছে সমাদৃত হবে।

অ্যারারুটি কি শুধুই খাদ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, নাকি আর ও কোনো ব্যবহার আছে। অ্যারারুট পাউডার মিহি এবং মসৃণ হওয়ায় খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও আমাদের প্রসাধন সামগ্রীত বিশেষ করে ফেস পাউডার, বডি

পাউডার এবং প্রসাধনীর ফাউন্ডেশনেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি একটি উদ্ভিজ্জ পাউডার বিধায় অনেক ক্ষেত্রে ট্যালক্যাম পাউডার থেকে উন্নত মানের এবং ত্বকের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বলে অনেকে মনে করেন। অ্যারারুট পাউডার শিশুদের জন্য একটি অতি উত্তম পাউডার বলে মনে করা হয় কারণ অনেক শিশুদের ত্বকই ট্যালকাম পাউডারের প্রতি সংবেদনশীল। Maranta arundinacea ছাড়াও Zamia integrifolia (ফ্লোরিডা অ্যারারুট), Manihot esculenta (কাসাভা অ্যারারুট), Pueraria lobata (জাপানী অ্যারারুট) অ্যারারুট-এর উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজ এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে।

প্রবন্ধকার : অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জৈব রসায়নের গোড়ার কথা

সৌমেন সাহা

জৈব পদার্থের প্রচলন আমরা আজ থেকে দেখছি না বা কেবলমাত্র দুশো-আড়াইশো বছর আগে থেকেও নয় (অর্থাৎ যখন থেকে সুশৃঙ্খলভাবে আধুনিক জৈব রসায়নচর্চা শুরু হয়), এদের পরিচয় জানা গেছে অতিদূর ইতিহাসের পাতা থেকে। অতীতকাল থেকে অনেক গাছগাছড়া ও জন্তু-জানোয়ারের উৎসে এইসব রাসায়নিকের অস্তিত্ব জানা ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষরা শুধু যে আখ থেকে চিনিকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন তা-ই নয়, ভাবলে অবাক লাগে, তাঁরা গাঁজন পদ্ধতি বা fermentation আবিস্কার করে চিনি থেকে অ্যালকোহল ও এক ধরনের অ্যালকোহলীয় পানীয় (যাকে এখন 'wine' বলে) থেকে ভিনিগার তৈরি করার কৌশল পর্যন্ত জানতে পেরেছিলেন। ঋগ্বেদে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ণিত সোমরস এক ধরনের fermented liquor যা সোমগাছের গুঁড়ি থেকে নির্গত রসকে ferment করে বা গাঁজিয়ে সৃষ্টি করা এবং উৎসবে ব্যবহৃত সুরা হল বার্লির দানা থেকে গাঁজানো এক প্রকার beer। যতদূর জানা যায়, আখের রস থেকে চিনি সর্বপ্রথম উদ্ধার করা হয় প্রাচীন ভারতে। আবার প্রাচীন মিশরীয়রা মঞ্জিষ্ঠ গাছের শিকড় থেকে একটি রঞ্জক পদার্থ উদ্ধার করেন। প্রাচীন ভারতেও মঞ্জিষ্ঠ গাছ থেকে একে উদ্ধার করা গেছে। আধুনিককালে ঐ রঞ্জক পদার্থটির নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যালিজারিন'। শোনা গেছে প্রাচীন মিশরে রাজা তুতেনখামেনের মমিতে যে লাল কাপড় মোড়া আছে তা অ্যালিজারিন দিয়ে রঙ করা। তাছাড়া রঞ্জক পদার্থ নীল, রজন, লাক্ষা ইত্যাদির ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে উল্লেখ আছে। পোড়া কাঠের ছাই থেকে পাওয়া ক্ষারের সাহায্যে প্রাণীজ চর্বিকে উত্তপ্ত করে সাবান প্রস্তুত করার পদ্ধতিটিও প্রাচীন। মধ্যযুগে কাঠের শুষ্ক পাতনে মিথানল, অ্যাসিটোন ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মিশ্রণ পাওয়া যায়। অ্যালকেমিস্টরা রাসায়নিক যন্ত্রপাতির প্রভূত উন্নতিসাধন করায় গলস্টোন থেকে কোলেস্টেরল, আফিম থেকে মরফিন, বিভিন্ন গাছ থেকে কুইনিন, স্ট্রিকনিন, ব্রসিন ইত্যাদি নিষ্কাশন করেন। তথ্য ঘাঁটলে দেখা যায়, এ ইতিহাসের বিশাল পরিধি- এ ইতিহাস শুধু জৈব রাসায়নিকের পরিচয় বহন করে না তাদের প্রয়োগের কথাও বলে।

সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জৈব রসায়ন চর্চা শুরু হয় প্রধানত অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে সুইডেনজাত রসায়নবিদ কার্ল উইলহেম শীলে এবং ফরাসি রসায়নবিদ অ্যানটয়েন ল্যাভয়সিয়রের পৃথক পৃথক কাজের মাধ্যমে। শীলে জীবদেহ থেকে বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ উদ্ধার করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন। অবশ্য এক শতাব্দী আগে লেমেরি সকল পদার্থকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন (ক) উদ্ভিজ (খ) প্রাণীজ (গ) খনিজ। ল্যাভয়সিয়রের কাজ আরও বিস্তৃত। তিনি রাসায়নিক পদার্থের মৌলিক সংযুক্তি নির্ণয় করেন। তিনি দেখেন যে, প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে যেসব পদার্থ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কার্বন ও হাইড্রোজেন মৌল আবশ্যিকভাবে বর্তমান থাকে, এছাড়াও অনেক সময় তাদের মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থাকে। তিনি পদার্থকে দুভাগে ভাগ করেন ঃ খনিজ প্রকার (সাধারণত শক্ত, উচ্চ গলনাঙ্ক সম্বলিত ও অদাহ্য) এবং জৈব প্রকার (প্রায়শই নরম, তল বা নিম্ন গলনাঙ্ক সম্বলিত কঠিন এবং অনেক সময়েই সহজ-দাহ্য পদার্থ)। অধিকাংশ জৈব পদার্থ জ্বলনে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় এবং পদার্থের হাইড্রোজেন জল বা স্টিমে পরিণত হয়। অনেক সময় কালো অঙ্গার অবশেষরূপে পড়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ চিনি জৈব পদার্থ,

সাধারণভাবে উত্তাপ দিলে সহজে ভেঙ্গে যায় ও কালো চারকোলে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সাধারণ লবণ 'খনিজ' পদার্থ, উত্তাপে অনেক বেশি স্থায়ী, ল্যাভয়সিয়রই সঠিকভাবে জৈব যৌগদের সনাক্ত করতে পারেন ও তাদের যথার্থ শ্রেণিবিভাগ করেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, এই শ্রেণিবিভাগের চেষ্টা আগে হয়নি বা জৈব পদার্থের বিশেষত্ব আগে ধরা পড়েনি। প্রকৃতপক্ষে জৈব পদার্থের শ্রেণিবিভাগ হয় ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব 1200-1500 অব্দে সেকালের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক চরক ও সুশ্রুতের আমলে।

চরক প্রাণীজ ও উদ্ভিজ পদার্থদিকে জৈব নামে সনাক্ত করেন এবং সমগ্র জৈব পদার্থকে প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ এই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে, গাঁজিয়ে তোলা তরল (fermented liquor), গাছের রস, গাছের ফল থেকে পাওয়া অ্যাসিড, উদ্ভিদের ছাই ইত্যাদি বৃক্ষসম্পর্কিত যাবতীয় পদার্থ হল উদ্ভিজ যৌগ। অপরদিকে মধু, দুধ, মাখন, চর্বি, পিত্ত, মূত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রাণীজ পরিত্যাজ্য পদার্থ হল প্রাণীজ যৌগ। চরক উদ্ভিজ তেল ও প্রাণীজ তেলেরও প্রকারভেদ করেছেন। ঘন পদার্থকে (তৈলাক্ত) চারভাগে ভাগ করা হয়েছে- মাখন, তেল, চর্বি, মজ্জা। লবণ দুরকমের- খনিজ এবং উদ্ভিজ লবণ। শুশ্রুত আবার বিষকে দুভাগে ভাগ করেছেন প্রাণীজ ও উদ্ভিজ। কিন্তু কিছু বিষকে, যারা মূলত খনিজ প্রকারের, ভুলক্রমে উদ্ভিজ প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এবার আবার আধুনিক জৈব রসায়নের গোড়ার সময়ে ফেরা যাক। ল্যাভয়েসিয়রের বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থেকে সমস্যাটির উপর মনোযোগ আরোপ করেন উনবিংশ শতকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস। তিনিই প্রকৃতপক্ষে "Organic Chemistry" (জৈব রসায়ন) নামটি দেন। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে সুইডেন বংশভূত এই রসায়নবিদ জোনস জ্যাকব বার্জেলিয়াস লক্ষ করেন যে, তখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কোনো জৈব পদার্থকে তার সংশিষ্ট মৌলের থেকে বা অজৈব পদার্থের থেকে কোনোমতেই কেউ পরীক্ষাগারে চালু রাসায়নিক পদ্ধতি দ্বারা সৃষ্টি করতে পারেননি। বার্জেলিয়াসের এই পর্যবেক্ষণ তাঁকে বহু পুরনো এক তত্ত্বের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

কার্ল উইলহেম শীলে

অ্যানটয়েন ল্যাভয়সিয়ের

জ্যাকব বার্জেলিয়াস

খ্রিস্টের জন্মের পর প্রথম শতাব্দী থেকে অ্যালকেমিস্টদের মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। তা হল, কিছু কিছু পদার্থ তাদের (আয়ুর্বেদ মতে) সনাতন "মৌলের" (ক্ষিতি অর্থাৎ মাটি, অপর অর্থাৎ জল, মরুৎ অর্থাৎ

বায়ু এবং তেজ অর্থাৎ অগ্নি) থেকে "প্রাণঃ ('Life form' ev 'Vitalis') সম্বলিত জীবাণুর সংস্পর্শে সংশ্লেষিত হয়। এই "তত্ত্ব" অনুযায়ী এইসব 'জৈব' থেকে 'অজৈব' যৌগের পার্থক্য হল, শেষের যৌগ মৌল থেকে সংশ্লেষিত হয় রাসায়নিক ক্রিয়াতে। আশ্চর্যের কথা, অ্যারিস্টটল-কথিত মৌলের ধারণা অথবা উপরিকথিত মৌলের আদি ধারণা বহুকাল যাবৎ বিদায় নিয়ে মৌলের আধুনিক ধারণা প্রচলিত হলেও এই তত্ত্ব কিন্তু বানচাল হল না। শুধু তাই নয়, উনবিংশ শতকে বার্জেলিয়াসের আমলেও পরিত্যক্ত হল না। তার কারণটা অমূলক নয়- বার্জেলিয়াস কোনো অবৈজ্ঞানিক সনাতন বিশ্বাসে ঐ তত্ত্বকে আঁকড়ে থাকেন নি। তাঁর তৎকালীন পর্যবেক্ষণই তাঁর ঐ অবস্থানে তাঁকে ধরে রাখতে বাধ্য করেছে। শুধু ইউরোপ নয়, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিতে এই Vitalis বিভিন্ন নামে প্রচলিত- ভারতবাসীর অন্তরে যদি জাগ্রত হয় 'প্রাণ', চীনে তা হয় 'সী', জাপানিতে 'কী'। 1815-তে বার্জেলিয়াস বললেন, জৈব পদার্থ এই 'প্রাণশক্তি'তে ভরপুর অর্থাৎ জৈব যৌগে মৌলের পরমাণুগুলি ঐ প্রাণশক্তির বেষ্টনে পরস্পর জড়িত যা অজৈব পদার্থের রাসায়নিক শক্তির থেকে ভিন্ন। যেহেতু ঐ প্রাণশক্তির উৎস জীবদেহের অন্তরে, অতএব বাইরে থেকে সংশ্লিষ্ট মৌলগুলির যোগসাজশে কোনো কৃত্রিম উপায় এইসব (জৈব) যৌগকে সংশ্লেষণ সম্ভব নয়। বার্জেলিয়াসের এই মতবাদের অবধারিত ফল এই যে, অজৈব ও জৈব পদার্থের মধ্যে গঠনগত ও প্রকৃতিগত এক অনড় ও স্থায়ী অন্তরাল গড়ে উঠল। এ অন্তরাল এমন নিরেট যে উপযুক্ত তথ্যের অভাবে শুধুমাত্র কোনো যুক্তি বা বুদ্ধির প্রয়োগে তা ভেদ করা অসম্ভব হয়ে উঠল- বিশেষত তা যখন বার্জেলিয়াসের মতো সেকালের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর দ্বারা গড়া মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, কেন-না বার্জেলিয়াস শুধু যে সমসাময়িক বিজ্ঞানে নেতৃস্থানীয় ছিলেন তা-ই নয়, তখনকার বিজ্ঞানীমহলে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথাও অবিদিত নয়।

সুতরাং ঐ মতবাদ যে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক তা জেনে বুঝেও কোনো দূর্ভেদ্য তথ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকে তার বিরুদ্ধে কারও কোনো বাক্যস্ফূর্তির সাহস জোগাল না। তবে 1828-এ ঐ অচলায়তন সম্পূর্ণ না ভাঙ্গলেও তাতে মোক্ষম ফাটল ধরল এবং তা ধরল একেবারে আচম্বিতেই। সে কথাতেই আসা যাক এবার।

1823 সালে ফ্রেডরিখ উলার নামে এক জার্মান তরুণ সদ্য ডাক্তারী পাশ করে তাঁর স্বাভাবিক রসায়নচর্চার প্রবণতা থাকায় তখনকার ইউরোপের বিখ্যাত রসায়নবিজ্ঞানী বার্জেলিয়াসের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণ করতে যান। সেখানে তিনি অজৈব ও জৈব পদার্থের মধ্যের অনড় ব্যবধানের বিষয়টিও জানলেন। কালে কালে তিনি গটিংজেনে রসায়নের অধ্যাপকপদে উন্নীত হন।

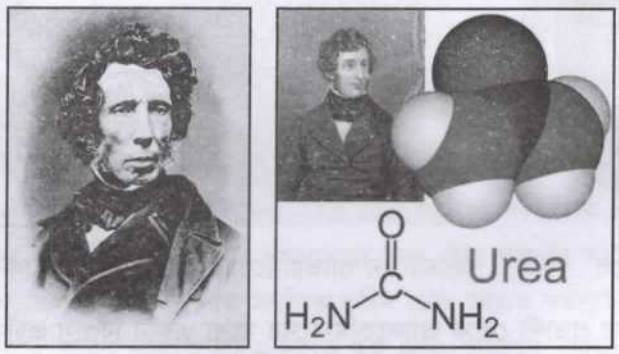

ফ্রেডরিখ উলার জৈব রসায়নের জনক

1828 সালে তিনি সেই ধরনের পদার্থ নিয়ে গবেষণা করছিলেন যেগুলি উত্তাপে (তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী) সায়ানাইডে বিশ্লিষ্ট হয়। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একদিন সিলভার সায়ানেটকে অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইডের দ্রবণের সঙ্গে উত্তপ্ত করলেন। তিনি আশা করেছিলেন, উভয়ের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ম সায়ানেট সৃষ্টি হবে যা উত্তাপে অভীষ্ট সায়ানাইড নির্গত করবে। কিন্তু তিনি দেখলেন, কিছু তো নির্গমণ ঘটলই না বরং এমন একটি সাদা রঙের স্ফটিকাকার পদার্থ পাওয়া গেল যাকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। তাঁর ডাক্তারিশাস্ত্রের অভিজ্ঞতার বলে তিনি সহজেই ধরতে পারলেন যে, ঐ সাদা পদার্থটি মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মূত্রের উৎস থেকে পাওয়া ইউরিয়া বৈ আর কিছু নয় ! আসলে অ্যামোনিয়া সায়ানেট উত্তাপে বিশ্লিষ্ট হয়ে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়েছে। ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে ইউরিয়া একটি প্রাণীজ পদার্থ অর্থাৎ অবিসংবাদিতভাবে জৈব পদার্থ, কিন্তু অ্যামোনিয়াম সায়ানেট একটি লবণ জাতীয় অজৈব পদার্থ। সুতরাং আকস্মিক ও কাকতালীয়ভাবে হলেও এইভাবে কোনো 'প্রাণশক্তি' ব্যতিরেকেই অজৈব পদার্থের সরল রাসায়নিক রূপান্তর ঘটল জৈব পদার্থে। ঐ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উলার 'Vital force theory'র অযৌক্তিকতাকে সাব্যস্ত করলেন, ঐ তত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। কিন্তু তখনও কিছু তত্ত্বের সমর্থক টিকে রইল খড়কুটোর মতো এই বলে যে এক্ষেত্রে জৈব পদার্থ ইউরিয়া নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থগুলি থেকে সৃষ্টি হয় নি।

তবে সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। ফলে বিজ্ঞানীমহল দ্বিগুণ উৎসাহেব মেতে উঠলেন জৈব-অজৈব বেড়া ভাঙ্গার খেলায়। অবশেষে 1845 সালে উলারের ছাত্র কোলবে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন থেকে জৈব পদার্থ অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও 1852 সালে সমকালীন আর-এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বার্থেলো কার্বন, হাইড্রোজেন থেকে মিথেন সংশ্লেষণ করে 'Vital force theory'র কফিনে শেষ পেরেক পুঁতলেন।

উলারের ছাত্র কোলবে

বিজ্ঞানী বার্থেলো

প্রমাণ হল, জৈব-অজৈব সবরকম যৌগেই একই রাসায়নিক শক্তি ক্রিয়াশীল। এরপর সব জানালা খুলে গেল। চিন্তার মুক্তি ঘটল সম্পূর্ণভাবে। এই অবস্থায় জৈব রসায়নচর্চা বিশেষ করে জৈব সংশ্লেষণের কাজ

চলতে থাকল অবাধে। আর এই কর্মযজ্ঞে অজৈব রসায়নচর্চাও থাকল সহায়ক ভূমিকা নিয়ে। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, যে ফ্রেডরিখ উলারের কাজে এ ঘটনা ঘটল তাঁর রসায়নে প্রাথমিক ঝোঁক ছিল অজৈব রসায়ন চর্চা এবং যে যুগান্তকারী কাজে জৈব রসায়নচর্চা সাবালকত্ব অর্জনের পথে বড়ো পদক্ষেপ ফেলল সেটিও মূলত অজৈব রসায়ন সংক্রান্ত।

বিষয়ের ভাগাভাগি আমরা নিজেরা করি আলোচনার সুবিধার্থে, শিক্ষাকে সুশৃঙ্খল নিয়মে বাঁধার প্রয়োজনে। কিন্তু পরীক্ষার নিজস্ব পথে, গবেষণা কাজের ফাঁকে কখন যে সেই বেড়া টপকানো হয় টেরও পাওয়া যায় না।

দুই আবিষ্কারের চমকপ্রদ কাহিনি

কোনো সন্দেহ নেই, ফ্রেডরিখ উলারের ইউরিয়া সংশ্লেষণ জৈব রসায়নের ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ। কারণ এর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীমহলে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে প্রাণশক্তি তত্ত্বের (vital force theory) পাহারাদারী এড়িয়ে জৈব অণুর অন্দরে কারও কোনো প্রবেশাধিকার নেই। এইসব আধিভৌতিক ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাওয়ার পর নানান উপায়ে জৈব যৌগের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তার সংশ্লেষণের চেষ্টা চলতে থাকল। অবশ্য 1816-তেই মাইকেল সেভরিউল চর্বি থেকে ক্ষারের সাহায্য নিয়ে সাবান তৈরি করেন, যদিও রূপান্তর ঘটাতে তথাকথিত 'প্রাণশক্তি'কে অবজ্ঞা করা হয়নি- কারণ চর্বিও জৈব, সাবানও তাই।

বোঝা যায়, সে আমলে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যৌগের রাসায়নিক গঠনের অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে সংশ্লেষণ কত কঠিন ছিল। তবে এ-ও ঠিক, যে কোনো উপায়ে সংশ্লেষণে সফলকাম হওয়ার মধ্যের ধরা পড়েছে তখনকার সীমিত জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ। অনেক সময়ে মূল যৌগের বদলে সৃষ্টি হয়েছে অন্য পদার্থ এবং এইভাবে অনেক নতুন পদার্থের আবিস্কারের পথ খুলে গেছে। তাই সে সময়ে অনেক আবিষ্কার ঘটেছে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে। পশ্চাৎপটে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাধারা অবশ্যই ছিল, কিন্তু সমসাময়িক রসায়ন জ্ঞান পর্যাপ্ত না থাকায় তা সুবিন্যস্ত ঠাসবুনোট হয়ে ওঠেনি। দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

1834 সালের গ্রীষ্মে দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত হওয়া এক লোহালক্কড় ব্যবসায়ী আমেরিকার প্রথম রাবার প্রস্তুতকারী সংস্থা রক্সবারি ইন্ডিয়া নামক রাবার কোম্পানিতে এসে তার গুদামের রক্ষককে তার নিজের বানানো একটি রাবারের ভালভ বিক্রি করতে চান। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যাত হলেন এই অজুহাতে যে রাবারের সামগ্রী গরমকালে গলে আঠার মতো হয়ে যাচ্ছে আর প্রচন্ড শীতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাঁকে প্রচুর অবিক্রিত রাবারের সামগ্রী দেখানো হল। রাবারের জন্য কোম্পানির নাকি 20000 ডলার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। ঐ জার্মান তরুণ যার নাম চার্লস গুডইয়ার- তাঁর নিরন্তর সাধনা হয়ে উঠল রাবারের রোগ সারানো- রাবার কি করে শীতগ্রীষ্ম সব মরসুমের উপযোগী হয়ে ওঠে। প্রায় আত্মবিস্মৃত হয়ে, এমনকি তার নিমজ্জমান সংসারের দুঃখ কষ্ট নির্দ্বিধায় স্বীকার করে ও দেনার বোঝা অনায়াসে জেল খেটেও তিনি তাঁর লক্ষ্যে অবিচল থাকলেন। নানান রাসায়নিক ব্যবহারের ব্যর্থ প্রচেষ্টার শেষে একেবারে হঠাৎ 1839-এর শীতের সকালে সালফার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে দেখলেন রাবারকে গন্ধক-দিয়ে উত্তপ্ত করতে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। উত্তাপের পর পদার্থটি গলে না গিয়ে শুষ্ক কালচে বাদামী চামড়ার মতো হয়ে গেল। ঐ নতুন পদার্থটি সকল মরসুমের উপযোগী, সুব্যবহারযোগ্য, স্থিতিস্থাপক শক্ত রাবার (উদাহারণস্বরূপ আধুনিক সময়ের গাড়ির

টায়ার)। বিজ্ঞানের ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকস্মিক ঘটনার মধ্যে পড়ে এই আবিষ্কার। কিন্তু রাবারকে এই অবস্থায় পৌঁছতে হলে সঠিকভাবে কতক্ষণ কতটা তাপ দিতে হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে অনেক মেহনতের মূল্য দিয়ে তিনি শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, উচ্চচাপে স্টিমের সাহায্যে চার থেকে ছয় ঘন্টা 270 ফারেনহাইট উষ্ণতায় উত্তাপ উৎকৃষ্টমানের রাবার পাওয়ার এটাই সঠিক শর্ত।

চালর্স গুডইয়ার

টমাস হ্যানকক

কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যতটা ছিল, ততটা ছিল না তাঁর বিষয়বুদ্ধি। আবিষ্কারের পর তাঁর কর্মকান্ড সেই কথাই বলে। তিনি এমন এমন জিনিস গড়ে তুলতে রাবার ব্যবহার করলেন যে তখনকার দুনিয়া তা ভাবতেও পারেনি। যেমন খাদ্যবস্তুর মোড়ক হিসাবে রাবারকে ভাবলেন 1850 সালেই- যা সম্প্রতি রাবার থেকে বানানো এক ধরনের প্লাস্টিক সামগ্রীর সাহায্যে সৃষ্টি করা গেছে। কিন্তু এইসব নানাধরনের কাজে মত্ত থেকে তিনি এতই আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন যে পেটেন্টের দরখাস্ত করতে যথেষ্ট দেরী হয়ে গেল। পেটেন্টের প্রয়োজনে পাঠানো তাঁর সালফার দিয়ে তাপ দেওয়া সামগ্রীটির (নমুনা) স্বরূপ উদঘাটন হওয়ার আগেই পদার্থটি টমাস হ্যানককের হাতে পড়ে, যিনি নিজেও এই একই কাজে বিশ বছর ধরে করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। হ্যানকক ঐ পরিবর্তিত রাবারের মধ্যে হলুদ সালফারকে চিনে ফেলেন ও এই সূত্র ধরে প্রক্রিয়াটির আঁচ পেয়ে যান। এর ফলে গুডইয়ারের আবিষ্কারের চার বছর পর 1843 সালে ঐ প্রক্রিয়ার পেটেন্ট নিয়ে গেলেন। শোনা গেল, গুডইয়ারের দরখাস্তের কয়েক সপ্তাহ আগেই হ্যানককের পেটেন্টের দরখাস্ত জমা পড়ে আছে। গুডইয়ারকে পেটেন্টের অর্ধেক শেয়ার দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। নিশ্চিত অর্থসম্পদ ত্যাগ করে জীবনসায়াহ্নে তিনি নিঃস্ব হয়েছিলেন- সুযোগ সন্ধানীর চক্রান্তের শিকার হলেন তিনি। যে গুডইয়ার কোম্পানির নাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছিল এবং কোটি কোটি ডলার মুনাফা লুটেছিল তার আদি প্রাণপুরুষ চার্লস গুডইয়ার 200000 ডলার ঋণ রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন 1860 সালে। শুধু তাই

নয়- উন্নতমানের রাবার সৃষ্টি করতে তিনি প্রাণপাত করে যে পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন সেই পদ্ধতির নাম 'ভালকানাইজেশন' দেওয়ার পেছনেও তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। একদিকে খামখেয়ালীপনা, অন্য দিকে দুর্ভাগ্য তাঁর সত্তাকে জড়িয়ে ছিল। তবে নিঃসম্পদ হলেও মনের দিক থেকে তিনি রিক্ত হননি। তাঁর আত্মনিমগ্ন বিজ্ঞানসাধনা দৃষ্টান্তস্বরূপ।

রবার তৈরী করছেন চালর্স গুডইয়ার

এবার দ্বিতীয় কাহিনিতে ফেরা যাক। এ কিন্তু ট্রাজেডি নয়, বরং কমেডি। তখন লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ কেমিস্ট্রিতে (এখনকার ইম্পিরিয়্যাল কলেজের অংশবিশেষ) গবেষণারত ছিলেন প্রখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ অগাস্ট উইলহেম ভন হফম্যান। সেখানে 1853 সালে পনেরো বছরের এক ব্রিটিশ কিশোর, উইলিয়াম পার্কিন তাঁর নাম- রসায়নে শিক্ষা নিতে এলেন হফম্যানের কাছে। হফম্যানও তাঁর সহকারী হিসাবে তাঁকে জায়গা দিলেন। হফম্যান সে সময়ে আলকাতরা থেকে নিষ্কাশিত বিভিন্ন যৌগের উপর গবেষণা করছিলেন। তাঁর মনে হল, আলকাতরা-জাত অ্যানিলিন থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন সংশ্লেষণ সম্ভব।

আধুনিক রসায়ন-চর্চা তখন তার শৈশবে। যেহেতু কোনো যৌগের বিশেষত জৈবযৌগের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিতে সংশ্লেষণের জন্য সেটির আণবিক গঠন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা দরকার, অতএব সে সময়ের রসায়ন-জ্ঞান তার আবশ্যকীয় স্তরে পৌঁছতে না পারায় এ কাজকে যথেষ্ট অনুমাননির্ভর হতে হয়। তা সত্ত্বেও যত সংশ্লেষণ সে আমলে ঘটেছে তার দ্বারা ঐ সময়ের স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিকদের প্রজ্ঞা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু কুইনিনের গঠন যথেষ্ট জটিল থাকায় তখন এটির সংশ্লেষণ নিতান্তই অসম্ভব ছিল।

হফম্যান তাঁর চিন্তার ত্রুটির কথা বুঝলেন না। উপরন্তু তিনি এ বিষয়ে এতই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে কী উপায় তিনি ঐ সংশ্লেষণ সাধন করবেন সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করে ফেললেন। তাছাড়া তখন কুইনিন সংশ্লেষণের একটা তাগিদও ছিল। ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন সেদেশে তখন যথেষ্ট মূল্যবান ছিল, কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো দূরান্ত থেকে তা আমদানি করতে হত- কুইনিন সংশ্লেষণ সম্ভব হলে তা নিঃসন্দেহে ওখানে সহজলভ্য হত, যার ফলে ওষুধের খরচ অনেক কমে যেত।

পার্কিন নিঃশব্দে তাঁর অধ্যাপকের ব্যাখ্যা শুনলেন। এরপর 1856 সালের গ্রীষ্মাবকাশে আঠারো বছর বয়সী পার্কিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে কালবিলম্ব না করে ছোটো একটি পরীক্ষা করলেন। তিনি অ্যানিলিনকে সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করে দ্রবণে পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট যোগ করলেন। এর ফলে একটি গাদজাতীয় পদার্থ সৃষ্টি হল যা তিনি অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দিচ্ছিলেন। এমন সময়ে তিনি লক্ষ করলেন যে, তার মধ্যে থেকে চমৎকার বেগুনী রঙের কোনো তরল যেন উঁকিঝুঁকি মারছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ পদার্থটিকে অ্যালকোহল দিয়ে ঝাঁকিয়ে অ্যালকোহলের নিষ্কাশিত অংশ উদ্ধার করে দেখলেন, তা একটি সুন্দর বেগুনী রঙের পদার্থ। পার্কিনের চিত্রাঙ্কন ও ফটোগ্রাফির পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, তার দৌলতে তিনি বুঝলেন- কুইনিন না হলেও এটি অবশ্যই একটি রঞ্জক পদার্থ (যার দ্বারা পোষাক-পরিচ্ছদ রঙিন করা যায়)।

অ্যানিলিন জৈগ

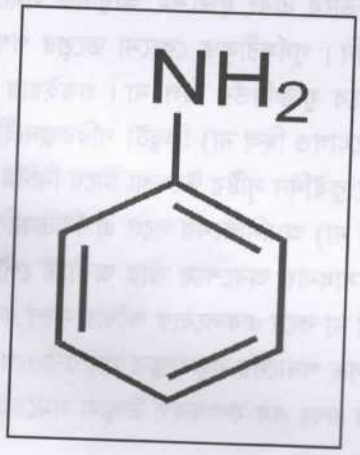

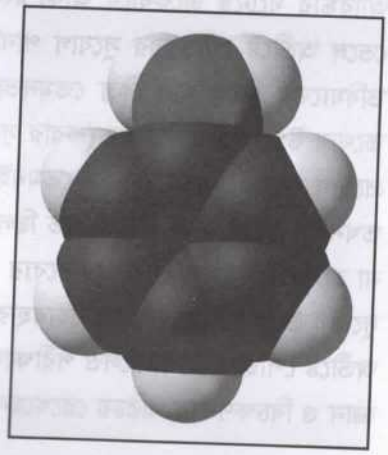

উইলিয়াম পার্কিন

সংশ্লেষিত রঞ্জক পদার্থের এটি প্রথম উদাহরণ। পদার্থটিকে প্রাথমিকভাবে বলা হল "অ্যানিলিন পার্পল"। ফরাসি প্রস্তুতকারকরা এর নাম দিল "মভ" (mauve) এবং কালে কালে তা "মভিন" (mauveine) নামে বিখ্যাত হয়ে গেল। রঞ্জকশিল্পে পার্কিনের 'মভ' বাজারে আসার সুফল ফলতে সময় লাগল না। কারণ সে পর্যন্ত সকল রঞ্জকদ্রব্যই ছিল প্রকৃতিজাত এবং এগুলির নিষ্কাশন যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ছিল, তার ফলে এগুলি ছিল খুবই মূল্যবান। শুধু তাই নয়, এইসব অনেক সময় 'fast' নয় অর্থাৎ কাচার পর রোদে দিলে রঙয়ের স্থায়িত্ব থাকে না। পার্কিনের সৌভাগ্য, এ দুটি প্রধান বিষয়ই তাঁর পক্ষে গেল। একে তো তাঁর প্রস্তুত রঙ রোদের আলোয় স্থায়ী, তার উপর প্রকৃতজাত পদার্থ থেকে নিষ্কাশিত না হওয়ায় রঙের উৎপাদনমূল্য যথেষ্ট কম যার ফলে শিল্পদ্রব্য হিসাবে তা আরও সফল। এই সফলতার আরও কারণ, এই রঙ প্রধানত সম্ভ্রান্ত সমাজের চাহিদা মেটায়, আর অভিজাত সম্প্রদায়ই এই সব বিলাসব্যসনের যে প্রধান খরিদ্দার তা তো বলাই বাহুল্য। তার ওপর আবার এই রঞ্জকের ফিকে লাল/হাল্কা বেগুনী রঙ সম্ভ্রান্ত পরিবারের বেশি পছন্দসই।

এ ছাড়া সে সময়টায় ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব চলছে যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে রঞ্জকশিল্পে নতুনত্ব সাদরে গ্রহণীয় ছিল। পার্কিন এ স্বর্ণসময়ের সুযোগ নিলেন। তিনি পরিবারের টাকায় রঙ প্রস্তুতির কারখানা

শুরু করলেন ও মাত্র আঠারো বছর বয়সে 1856 সালের অগাস্ট মাসে ঐ শিল্পদ্রব্যের পেটেন্টের জন্য দরখাস্ত করলেন।

এরপর তাঁর গবেষণা চলতেই থাকল। আরও উন্নততর রঞ্জকদ্রব্য সৃষ্টি করলেন- যেমন অ্যানিলিন ব্ল্যাক (1860), অ্যানিলিন রেড (1859) ইত্যাদি। পার্কিন বৃহৎ সংশ্লেষিত রঞ্জক শিল্প সংস্থার মূল কর্ণধার হলেন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ইংল্যান্ডের ধনী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হয়ে উঠলেন। তাঁকে যে কেন সংশ্লেষিত রঞ্জকদ্রব্যের জনক বলা হয় তা সহজেই অনুমেয়। শুধু রঞ্জকশিল্পেই নয়, পার্কিনের গবেষণা ব্যপ্ত ছিল সুগন্ধ শিল্পেও। পার্কিন আজও বিখ্যাত তাঁর নামাঙ্কিত বিক্রিয়ার মাধ্যমে।

চার্লস গুডইয়ার ও উইলিয়াম পার্কিনের কাজের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাই যে দুজনের ক্ষেত্রেই আবিষ্কার ঘটেছে একেবারে আকস্মিকভাবে এবং দুজনেই আধুনিক সময়ের মতো তত্ত্বের সাম্রাজ্যের সিঁড়ি ভেঙ্গে অভীষ্টে পৌছনোর সুযোগ পাননি। পূর্বসূরীকৃত কোনো তত্ত্বের পশ্চাৎপট না থাকায় দুজনের ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি কিন্তু তেমনভাবে যুক্তিনির্ভর ছিল না। গুডইয়ার যেমন কোনো রাসায়নিক তত্ত্ব বা তথ্যের উপর ভিত্তি না করে (করার সুযোগও ছিল না) কিছুটা পরিকল্পনাহীনভাবেই রাবারের উপর রাসায়নিক প্রয়োগ করে চলেছেন, পার্কিন তেমনই কুইনিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে নির্দিষ্ট রাসায়নিক জ্ঞান ব্যতিরেকে (যদিও তখনকার ভান্ডারে ঐ জ্ঞান মজুত ছিল না) অ্যানিলিনের সঙ্গে ঐ বিক্রিয়া ঘটিয়েছেন। তবে সুপরিকল্পিতভাবে না হলেও গুডইয়ার কিন্তু একলব্যের সাধনায় অবশেষে তাঁর অভীষ্টে পৌছেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এক দুর্জ্ঞেয় উদাসীনতায় সময়ের সদ্ব্যবহার না করে একলব্যের আঁধার বরণ করলেন। অন্যদিকে পার্কিন কিন্তু তাঁর অভীষ্টে পৌছতে না পারলেও পরীক্ষালব্ধ পদার্থের নতুনত্বের সনাক্তকরণের মধ্যে তাঁর সমসাময়িক রাসায়নিক জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিচয় রেখেছেন এবং এর ফলস্বরূপ উজ্জ্বল সময়ের সম্ভাব্যতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রবন্ধকার : জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখা ও গ্রন্থাগার, ৯৯ বসিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীবস্তুসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন আবশ্যক
- কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দলগতভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চাইলে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিবহণ (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ও টিকিটে বিশেষ ছাড় এর ব্যবস্থা রয়েছে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

▶ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের সময়সূচি

- রবিবার থেকে বুধবার সকাল ৯:০০ থেকে বিকাল ৫:০০
  শনিবার সকাল ৯:০০ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০
  শুক্রবার দুপুর ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:০০
  বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

▶ নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘরের গ্যালারি খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

এখানে স্বল্প দৈর্ঘ্য 4D movie প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৮১৮১৩২৮